৩ নভেম্বর

জেল হত্যার পূর্বাপর

শারমিন আহমদ

৩ নভেম্বর
জেল হত্যার পূর্বাপর

৩ নভেম্বর
জেল হত্যার পূর্বাপর

শারমিন আহমদ

ঐতিহ্য

৩ নভেম্বর : জেল হত্যার পূর্বাপর
শারমিন আহমদ

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
কার্তিক ১৪২১
নভেম্বর ২০১৪

প্রচ্ছদ
এ আর নাইম

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
তিনশত টাকা

3 NOVEMBER : JAIL HOTTAR PURBAPOR by Sharmin Ahmad
Published by Oitijjhya
Date of Publication : November 2014

website: www.oitijjhya.com
Email: oitijjhya@gmail.com

Price: Taka 300.00 US$ 15.00
ISBN 978-984-776-175-6

উৎসর্গ

বিনা বিচারে, প্রহসনমূলক বিচারে নিহত ও
সত্য প্রতিষ্ঠার সুকঠিন সংগ্রামে নিবেদিতদের প্রতি

ভূমিকা

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম. মনসুর আলী ও এ.এইচ. এম. কামরুজ্জামানের নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটে। মানবতা লংঘনকারী ঐ নির্মম হত্যাকাণ্ডগুলো এমন এক সময়ের ইতিহাস যাকে দল-মতের উর্ধ্বে উঠে বস্তুনিষ্ঠভাবে গবেষণা এবং বিশ্লেষণ না করা ও তার থেকে শিক্ষা না নেবার বিষয়টিও ছিল অন্যতম এক কারণ, যে জন্যে আমরা আজও সত্যিকারের এক সভ্য রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হতে পারিনি। যে কারণে আজও বাংলাদেশ লাভ করেনি মানসিক স্বস্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। এই বিষয়গুলো নিয়ে নির্মোহভাবে ও যুক্তি তথ্যের আলোকে মৌলিক গবেষণা আমাদের দেশে খুব কমই হয়েছে। আজকের প্রজন্ম যারা সেই সময়টি সম্বন্ধে জানে না বা তাদেরকে আমরা সঠিকভাবে জানাতে ব্যর্থ হয়েছি বিশেষত তাদের জন্যই সেই ইতিহাসের অতি সংক্ষিপ্ত এই বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পরিবারসহ নির্মমভাবে নিহত হন। বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন, তাঁর মন্ত্রিসভা ও বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী জুনিয়র আর্মি অফিসাররা ক্ষমতা দখল করে। অবৈধভাবে রাষ্ট্রপতির পদ দখলকারী মোশতাক অর্ডিন্যান্স জারি করে যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি জেনারেল আতাউল গনী ওসমানী যিনি বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত এক দলীয় বাকশালের প্রতিবাদ করে তাতে যোগদান করেননি, তিনি নির্দ্বিধায় বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদে যিনি ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুসহ নারী-শিশুর হত্যাকারীদের অন্যতম মোশতাকের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার পদে নিয়োজিত হন। চিফ অব আর্মি স্টাফ মেজর জেনারেল কে. এম শফিউল্লাহ বিনা প্রতিবাদে, হত্যাকারী মোশতাকের পক্ষ সমর্থন করে রেডিও স্টেশনে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। ২৪ আগস্ট ওনাকে চিফ অব আর্মি স্টাফের পদ থেকে সরিয়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তার স্থলাভিষিক্ত হন। সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসকারনহাসের কাছে ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের অন্যতম পরিকল্পক তৎকালীন মেজর ফারুক রহমান ও আব্দুর রশীদের দেয়া টেলিভিশন সাক্ষাৎকার হতে জানা যায় যে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে জুনিয়ার অফিসাদের অভ্যুত্থানে তারা মোশতাক ও জিয়া উভয়ের সমর্থন লাভ করেছিল। বলা বাহুল্য যে জিয়াউর রহমান হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেন নি বরং হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না এই অর্ডিন্যান্সকে পরবর্তী সময় রাষ্ট্রপতি হবার পর সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনীর (৬ এপ্রিল, ১৯৭৯) মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে ঠাই করে নেন। (বলাবাহুল্য, কোনো অন্যায় কখনই আইনত বৈধ হতে পারে না। তা একদিন বাতিল হতে বাধ্য) ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের দুইমাস বিশ দিন পর ৩ নভেম্বর ১৯৭৫

রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী বঙ্গবন্ধুর চার সহকর্মী জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম. মনসুর আলী ও এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান নিহত হন। ঐ একই রাতে অবৈধ মোশতাক সরকার ও বঙ্গভবন দখলকারী হত্যাকারী সেনা অফিসারদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং জিয়াকে গৃহবন্দি করে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। তার মাত্র চার দিন পরে, ৭ নভেম্বর সিপাই বিদ্রোহে (এই দিনটিকে সিপাই জনতার অভ্যুত্থান বলা হলেও আসলে এই বিদ্রোহটি ছিল বামপন্থী জাসদ সংগঠিত এবং সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ এতে ছিল না) নেতৃত্বদানকারী কর্নেল তাহের, জিয়াকে মুক্ত করেন। ঐ একই দিন খালেদ মোশাররফ ও তাঁর দুই সহকর্মী কর্নেল নাজমুল হুদা ও কর্নেল এ.টি.এম হায়দার নিহত হন। তাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকারীরা এই অপবাদ ছড়ায় যে খালেদ ও তার অনুগামীরা ভারতের দালাল। যারা খালেদ মোশাররফ সমন্ধে কিছুটা ধারণা রাখেন তারা জানেন যে এই অকুতভয় স্বাধীনচেতা বীর মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে ঐ কথাটি ছিল অপপ্রচার মাত্র। পরবর্তী সময় জিয়াকে মুক্তকারী, কর্নেল তাহেরকেই এক প্রহসনমূলক গুপ্ত বিচারের মাধ্যমে জিয়া ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেন এবং বহু দলীয় গণতন্ত্রের নামে ৭১এর পরাজিত ঘাতক দালালদের পুনর্বাসিত করেন। জিয়াউর রহমান পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার পর তিনি মেজর জেনারেল মঞ্জুর নির্দেশিত আরেক ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে নিহত হন। মঞ্জুরও সেই অভ্যুত্থানে বন্দী হয়ে নিহত হন। জিয়ার বিএনপি সরকারকে এক রক্তপাতহীন ক্যু এর মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আসেন ১৯৮২ সালে। এই এতগুলো বছরেও জাতির জনক ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী চার নেতা, যারা গোটা জাতিরই নেতা, তাদের হত্যার কোনো বিচার হয় না। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয় আরও চৌদ্দ বছর; আওয়ামী লীগ সরকার দীর্ঘ একুশ বছর পর পুনরায় ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত।

১৯৮৭ সালে আমি যখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে এসে জেল হত্যাকাণ্ডের ওপর তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করি তখন অবাক হয়ে লক্ষ করি যে এই সম্পর্কে হত্যাকাণ্ডের সুদীর্ঘ বারো বছর পরেও তথ্য, উপাত্ত এবং প্রমাণসহ গবেষণামূলক কোনো লেখনী প্রকাশিত হয়নি। জেল হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী ব্যক্তিবর্গ এবং এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার, ইতিহাসের উপাদান হিসেবে যার গুরুত্ব অনেক, তা সংগ্রহ করে জাতিকে জানাবারও কোনো প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি। জাতির বিবেককে যারা নাড়া দেবেন বলে আশা করা যায় সেই বুদ্ধিজীবী সমাজ এই বিষয়টি সমন্ধে জানতে এবং জানাতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। আমাদের এমনিতর ইতিহাস সংরক্ষণ চেতনার অভাবের কারণেই তো ঘটে যায় আরও নির্মমতা এবং জাতি ঘুরপাক খায় বিভ্রান্তিতে। বৈহাসিকের পার্শ্ব চিন্তা কলামে, প্রখ্যাত কলামিস্ট আবু জাফর শামসুদ্দীন, জাতীয় ইতিহাসের মর্মান্তিক ঘটনাবলি সম্পর্কে আমাদের এই সম্মিলিত উদাসীনতা ও অবহেলাকে চিহ্নিত করে জাতির কাছে কিছু প্রশ্ন রেখেছিলেন। জেলহত্যা দিবসে তিনি লিখেছিলেন "কী দোষ করেছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁর তিন সহকর্মী এ প্রশ্নের জবাব এ পর্যন্ত কোনো সরকার দেয়নি। আমরা দেশবাসীও সোচ্চার হয়ে এ প্রশ্ন করিনি এবং তার জবাব চাইনি। এই যে প্রশ্ন করিনি এবং তার জবাব চাইনি এটাও আমাদের লজ্জার বিষয়– গণতন্ত্রের সমর্থক রূপে প্রশংসিত নাগরিকদের কর্তব্যকর্মে চরম ঔদাসীন্য ও অবহেলার প্রমাণ।" (সংবাদ, ৫ নভেম্বর, ১৯৮৪)

জয় আমাদের সুনিশ্চিত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন

ঢাকায় পৌঁছে আমি যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করি ও সাক্ষাৎকার নিই তারা হলেন স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৭২-৭৩) আব্দুস সামাদ আজাদ, জেল হত্যা তদন্ত কমিশনের সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কে .এম সোবহান (৭ নভেম্বর জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণের পর তদন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়) স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এ.এস.এম মহসীন বুলবুল, ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক বীর উত্তম (ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নির্দেশে তিনি জেল হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ডিআইজি প্রিজন্স আব্দুল আউয়াল ও জেলার আমিনুর রহমানের রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার নেন) ও প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল মোমিন। উল্লেখিত প্রথম ও তৃতীয় সাক্ষাৎকারদাতা ১৯৭৫ সালে চার নেতার সাথে জেলে বন্দী ছিলেন। এছাড়াও তাজউদ্দীন আহমদের শৈশব ও ছাত্র জীবন সম্পর্কে ওনার শিক্ষক ও ভাই-বোনদের সাক্ষাৎকার নিই। ৭৫ এ জেলে কর্মরত কর্তৃপক্ষর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। আরও যাদের সাথে দেখা হয় তারা সে সময় আমাকে সাক্ষাৎকার দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। বঙ্গবন্ধু ও জেল হত্যাকারী লে. কর্নেল ফারুক ও রশীদ তখন দেশে ফিরে ফ্রিডম পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা প্রকাশ্যেই শেখ মুজিবের মরণোত্তর বিচার করবে বলে হুমকি দিচ্ছে। লে. কর্নেল ফারুক জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে ১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছে। মোশতাক দুর্নীতির দায়ে জেল খেটে বেরিয়ে তার আগামসিহ লেনের বাড়িতে বহাল তবিয়তেই আছে। (তাকে হত্যাকাণ্ডর জন্য বিচারের মুখোমুখি কখনই দাঁড়াতে হয়নি, তার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন) সুতরাং এই পরিস্থিতিতে, অনেকেই যে কোনো তথ্য বা সাক্ষাৎকার দিতে অপারগতা প্রকাশ করবে সেটাই হয়তো স্বাভাবিক। তারপরেও সেদিনের সাক্ষাৎকার হতে জেল হত্যা সম্পর্কে যে চিত্রটা মনে অস্পষ্ট ছিল তা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জেল থেকে চিরতরে ও রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যাওয়া তাজউদ্দীন আহমদের মহামূল্যবান ও ঐতিহাসিক ডায়েরিটি কে নিয়েছিল সে সমন্ধেও জানতে পারি। ১৯৮৭ তে সংগ্রহকৃত তথ্যাবলির ভিত্তিতে রচনা করি "৩ নভেম্বরের জেল হত্যা ও বিবেকের আত্মাহুতি" প্রবন্ধ যা ১৯৮৮ সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত প্রথম নিয়মিত সাপ্তাহিক "প্রবাসী" পত্রিকা এবং পরে বাংলাদেশের অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিন বছর পরে, ১৯৯১ সালে আমার ছোটবোন সিমিন হোসেন রিমি বহু কষ্টে অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি প্রিজন্সের ঠিকানা যোগাড় করে তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। ডিআইজি সহ অবসরপ্রাপ্ত আইজি প্রিজন্স নুরুজ্জামান, জেলার আমিনুর রহমান ও সুবেদার ওহায়েদ মৃধার সাক্ষাৎকার সে ভোরের কাগজ পত্রিকায় এবং তার লেখা "আমার ছোটবেলা, ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ" বইয়ে প্রকাশ করে।

বলা বাহুল্য যে নিজ পিতা ও তাঁর তিন সহকর্মীর নির্মম ও অন্যায় হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহর কাজটি মনের দিক থেকেও সহজ সাধ্য ছিল না। তারপরেও করতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারী অন্যন্য সংগঠক এক অসাধারণ চরিত্রের বাবার প্রতি অসীম ভালোবাসা থেকে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ের তাঁর তিন সহযোদ্ধার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা হতে। রক্তস্নাত নির্মম অতীতের উত্তরসূরি, দিশাহীন এই বর্তমানের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথটিতে, নতুন প্রজন্ম একদিন আশা ও শান্তির আলো ছড়াবে সেই পরম প্রত্যাশা হতে।

শারমিন আহমদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

৩ নভেম্বরের জেল হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে আমার মা প্রয়াত সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন আমার পাশে থেকে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক গবেষণা পরিষদের তৎকালীন আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এম.এ বারী জেল হত্যাকাণ্ডের তদন্তর দাবি করে আই.জি পুলিশের কাছে প্রেরিত চিঠির (১০.৭.১৯৮৭) কপি আমাকে ১৯৮৭র সাক্ষাতে দেন। তাজউদ্দীন আহমদের জন্মভূমি দরদরিয়া গ্রাম ও গাজীপুর এলাকাবাসীরা চার জাতীয় নেতার হত্যার বিচার দাবি করে স্বাক্ষর প্রদান করেন। জেল হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ভূমিকায় উল্লেখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন তথ্য ও সাক্ষাৎকার দেন। ভয়েস অব আমেরিকার প্রাক্তন সংবাদ পাঠক মনসুর আলী টেপ রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকারগুলো ট্র্যান্সক্রাইবে সহযোগিতা করেন। ঐতিহ্য'র কম্পিউটার বিভাগের মো. জহিরুল ইসলাম এই বইটিকে কম্পোজ করেন। ঐতিহ্য'র প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান নাইম বইটি প্রকাশে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমার পরিবার, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা এই বইটি প্রকাশে আমাকে উৎসাহ যোগান। তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার সুগভীর কৃতজ্ঞতা।

শারমিন আহমদ
ম্যারিল্যান্ড
১৫ অক্টোবর, ২০১৪

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট

৩ নভেম্বর : অমর্ত্যলোকে যাত্রা

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরের শোকাবহ এই দিনটিতে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার অভ্যন্তরে, মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী নিহত হন। ব্যক্তিগতভাবে আমরা সবাই হারাই আমাদের প্রিয়জনকে এবং জাতি হারায় তার স্বর্ণ সন্তানদেরকে। এই লেখায় জেল হত্যাকাণ্ডের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ সেই শোকেরই ব্যক্তিগত কিছু স্মৃতিচারণ তুলে ধরব।

আব্বুর অমর স্মৃতির প্রতি নিবেদিত তাজউদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ শিক্ষা বিভাগে, ২০১১ সালে। প্রতি জুলাইয়ে আব্বুর জন্ম মাসটিতে স্মারক বক্তৃতা, ফিমেল এম্পাওয়ারমেন্ট বৃত্তি এবং স্নাতকে প্রথম শ্রেণীতে সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপ্ত ছাত্র বা ছাত্রীকে তাজউদ্দীন আহমদ শান্তি স্বর্ণ পদক ও মাস্টার্স সমাপ্ত করার জন্য বৃত্তির আয়োজন করা হয়ে থাকে। ট্রাস্ট ফান্ডটির অনুষ্ঠানের আয়োজন উপলক্ষে আমি এ সময়টিতে আমেরিকা হতে ঢাকায় পাড়ি জমাই। আব্বুর জন্ম মাস, জন্মদিন এই শব্দগুলোকে ঘিরে কোনো আয়োজনের সময় আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে ভবিষ্যতে। নতুন প্রজন্মর দিকে। তাদের সাথে চিন্তা ভাবনার বিনিময়ের মাধ্যমে সেতু বন্ধনের সুযোগ আসে। তাদের মধ্যে দিয়ে আগামীর স্বপ্ন ও সম্ভাবনার বাংলাদেশকে দেখার চেষ্টা করি।

৩ নভেম্বর আব্বুর রক্ত ঝরা মৃত্যুর দিনটি– ১৯৭৫ সালের বেদনাপূর্ণ নভেম্বর মাসের স্মৃতি, আব্বুর জন্ম দিনটিতে ভুলে থাকার চেষ্টা করি। কিন্তু ঐ চেষ্টা যেন ক্ষতের ওপর ব্যান্ডেজ লাগানোর মতোই। ব্যান্ডেজটা সরে গেলেই উন্মুক্ত হয় সেই স্মৃতি, কিশোরকালের সবচাইতে মর্মান্তিক বেদনার আলেখ্য। এবার তাই হলো, অজান্তে, আকস্মিকভাবে। ট্রাস্ট ফান্ড অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র আমার মামাতো বোন নাসরিনকে দিতে গিয়ে। সে ওর পুরনো চিঠিপত্রের বাক্স গোছাতে গিয়ে খুঁজে পেয়েছে আমার এক চিঠি। আব্বুর ইহলোক ত্যাগের মাত্র ছয় দিন পরে চট্টগ্রামে ওর পিঠাপিঠি বড় বোন ইয়াসমিন এবং ওকে লেখা

চিঠি। আব্বুকে হত্যা করার পরেও আমাদের বাসায় আর্মি পুলিশের নজরদারি ও হয়রানি এবং আমাদের নিরাপত্তার কারণে আমার বড় মামা অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া ঢাকার রাজাবাজারের ইন্দিরা রোডের ওনার ভাড়া বাড়িতে আমাদেরকে নিয়ে এসেছিলেন। ব্যবসার কারণে তিনি সে সময় ঢাকা ও চট্টগ্রামে যাতায়াত করতেন। চিঠিটা ঐ সময় লেখা। এক পনেরো বছরের কিশোরী তার মনের অবস্থা ব্যক্ত করছে তারই সমবয়সী আত্মীয়দের কাছে। সামান্য বিবর্ণ হয়ে আসা নরম কাগজে লিপিবদ্ধ সেই চিঠির মধ্যে আমি ডুবে গেলাম। ভুলে যাওয়া চিঠি খানি পড়লাম নতুন করে। বেদনাসিক্ত সেই সময়ের দুয়ার উন্মোচন করে।

চিঠির ওপরে ইংরেজিতে লেখা "মে গড ব্লেস ইউ" তার নিচে লেখা "ফরগেট মি নট" ডানে "লাভ" এবং বায়ে "পিস"। চিঠিটি শুরু হয়েছে এভাবে :

"প্রিয় নাসরিন ও ইয়াসমিন, ৯/১১/৭৫

প্রথমেই তোমরা আমার আন্তরিক ভালোবাসা নিও। তোমরা কেমন আছ ? আমরা একরকম ভালো আছি।

আমরা সবাই গত পরশুদিন থেকে তোমাদের বাসায় আছি। ভবিষ্যৎ বলতে আমার দুচোখে যেন কিছু আপাতত নেই। দেশেরই যদি ভবিষ্যৎ না থাকে তবে আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ দেশের জনগণের ভবিষ্যৎ থাকবে বলে কি আশা করা যায়। আব্বুর কথা তো জান। এ দেশের মাটিতেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এটা। বাংলাদেশ কত নরম-কোমল-সবুজে ভরা একটি ছোট্ট দেশ– কিন্তু সে দেশের মাটির মাঝেই ঘটে যায় কত শত নিষ্ঠুর রক্তাক্ত ঘটনা ও ইতিহাস। তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে গেল সেদিন। জান আব্বু মারা গেছে যখন শুনলাম তখন বিশ্বাস করিনি একটুও। আমার শুধু মনে হচ্ছিল– হতেই পারে না আব্বুর মতো দেবতার মতো মানুষ তিনি কেন মরতে যাবেন ? তাছাড়া আব্বুর তো কতশত কাজ দেশের প্রতি এখনো পড়ে রয়েছে, তবে এমন কেন হতে যাবে ! কিন্তু তারপর যখন কনফার্ম হলাম– তখন ঘরে বসে একলা চিৎকার করে অনেকক্ষণ কাঁদলাম– তারপরেই আমার কান্না যেন সব ফুরিয়ে গেল– একটুও আর কান্না আসেনি। আম্মার মুখের দিকে তাকিয়ে শক্ত হয়ে আছি। কেঁদে তো আর ফিরে পাব না– কিন্তু তবু মাঝে মাঝে মনে হয় একটু প্রাণ ভরে কেঁদে মনটা হালকা করে নিই। কিন্তু চোখে কান্না যে আসে না ! ক'রাত ভাল ভাবে ঘুম আসে না– আর ঘুম যখন অজান্তেই এসে পড়ে তখন রীতিমত নাইটমেয়ার দেখি। অথচ কল্পনা কর আগে আমি কেমন ঘুম কাতুরে ছিলাম ! এখন বিছানায় শুই ঠিকই কিন্তু শান্তির বিছানায় নয়– দুশ্চিন্তার কোলে শুয়ে পড়ি।"

আব্বুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের ফলে আমি যেন হঠাৎ করেই সত্যিকারের বিচ্ছেদ বেদনাকে আবিষ্কার করি প্রথমবারের মতো। আমাদের জীবনের অনেকখানিই বদলে যায় রাতারাতি। এমনকি একমাত্র ভাই, সে সময়ের পাঁচ বছরের ছোট্ট সোহেলকেও পরিচিত হতে হয় জীবনের এই নতুন ধারার সাথে। এই আবিষ্কারটি দুঃখজনক হলেও জীবনের পরম পাওয়াও বটে। জীবনের গভীরতম দুঃখবোধই বোধ হয় পারে অন্যের গভীরতম বেদনার আরও কাছাকাছি হতে এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনের এই বৃত্ত পেরিয়ে অসীম দিগন্তকে খুঁজতে। এই দ্বৈততার নামই হয়তো জীবনের প্যাকেজ ডিল।

আব্বুর হত্যাকাণ্ডের পর আমার জীবনের প্রথম পাওয়া ডায়েরিটিতে আমি উজাড় করে লিখতাম মনের কথা। যে ব্যথা প্রকাশ করতে পারতাম না তা নিভৃতে ব্যক্ত করতাম ডায়েরির পাতায়। লেখার মধ্যে অতি কষ্টদায়ক এই শূন্যতা বোধকে রূপ দিয়ে যে অনেকটা সেলফ থেরাপির কাজ করছিলাম তা সেদিন জানার কথা ছিল না। পরে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাঙ্গনে শিশু মনস্তত্ত্বের ওপর লেখাপড়া শুরু করার পর বিষয়টি সমন্ধে জানা হয়। নব্বই দশকে বসনিয়ায় গণহত্যা বন্ধের আন্দোলনে যখন সরাসরি জড়িয়ে পড়ি, তখন বসনিয়ার শিশু-কিশোর যারা প্রত্যক্ষ করেছে নির্মমতা এবং প্রিয়জনের সহিংস মৃত্যু তাদেরকে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে নানারূপে সহায়তা ছাড়াও তাদের হাতে আমরা তুলে দেই রং তুলি। শিশু কিশোররা, যারা বেদনার ভারে কথা বলা প্রায় ভুলে গিয়েছিল তারা কথা বলা শুরু করে রং তুলির মাধ্যমে। তো ৭৫ এর সেই ডায়েরিটিই হয়ে যায় অনেকটা রং তুলির মতো।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা স্বরূপ আব্বু-আম্মার কাছে অনেকেই ক্যালেন্ডার, অ্যাপয়েন্টবুক ইত্যাদি পাঠাতেন। সে ভাবেই ডায়েরিটি পাওয়া। এই প্রযুক্তি ও ভোগবাদী যুগের বিস্ফোরণ তখনো ঘটেনি। নতুন বইয়ের গন্ধ, ডায়েরির মলাটের স্পর্শ, রোজার ঈদের চাঁদ দেখা সবই হৃদয়কে উদ্বেলিত করত নির্মল আনন্দে। নিখরচায় সেই নির্দোষ আনন্দ প্রাপ্তির মূল্য ছিল অমূল্য। আমি মনের আবেগে সেই ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছিলাম বসন্তের আগমনী, নীল সাগর, জোসনা ও আব্বু-আম্মার সাথে শ্রাবণের ঝড়ো হাওয়ায় বৃষ্টি দেখার মধুর স্মৃতি। স্মরণ করেছিলাম ১৮ এপ্রিলের দিনটিতে মহান বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজদের সাথে সসস্ত্র সংগ্রামের কথা। তখন কে জানত যে এক স্বপ্ন পিয়াসী কিশোরী ঐ একই ডায়েরিতে ধারণ করবে তার জীবনের সবচেয়ে বেদনার স্মৃতিকে ! মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারী, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আপসহীন- নিষ্কলুষ নেতা তাজউদ্দীন আহমদের মর্মান্তিক ও অকাল মৃত্যুকে তাঁর কন্যা গেঁথে রাখবে রক্তাক্ষরে তার জীবনের প্রথম পাওয়া ডায়েরিটিতে।

বুধবার, ৫ নভেম্বর, ১৯৭৫

"আমার জীবনে এ কী ঘটে গেল ? কেন এমন ঘটল ? আব্বু আর নেই। এ পৃথিবী ছেড়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। গতকাল সকাল থেকেই শুনছিলাম আব্বুকে নাকি রোববার (দিবাগত) রাতে জেলে ঢুকে গুলি করে মেরেছে। আমি বিশ্বাস করিনি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। ভেবেছি আব্বুকে মারবে কেন ? মারবে কেন ? হাসান ভাই (আমাদের ভাতৃসম পারিবারিক বন্ধু) ও আমি রিকশায় চড়লাম। আব্বুর খবর শুনলাম। (আম্মা, ছোট বোন রিমি ও আমি সারাদিন ধরে পাগলের মতো ঘুরছিলাম জেলে হত্যাকাণ্ডর গুজবের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য। হত্যাকাণ্ডের পর দুই দিন পর্যন্ত সরকারি প্রশাসন ও মিডিয়া এই বিষয়ে নীরব থাকে।) আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। বাসায় এলাম। ঘরে গেলাম। চিৎকার করে সবার আড়ালে কাঁদলাম। কাঁদবার পর যেন পথ দেখতে পেলাম। আব্বু যেন হাসছে, বলছে 'চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে !' মনকে শক্ত করলাম। যতক্ষণ লাশ না দেখেছি, বিশ্বাস করতে পারিনি। লাশ এল। দেখলাম। সবার সাথে কাঁদলাম। তারপর থেকে আমার এ কী হলো ! আমার চোখে যে পানি আসছে না। আমি পাথর হয়ে গেছি। আম্মার দিকে তাকিয়ে মনকে পাষাণ বেঁধেছি। আমরা শুধু আব্বুকে হারাইনি। সারা দেশের একটা সম্পদ হারিয়েছি। অমানুষিক হত্যা ! জেলে ঢুকে রাতের বেলা পশুর মতো গুলি করে মেরেছে। আব্বু তো মরেনি ঘুমিয়ে আছে সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের অন্তরে। আব্বুর আদর্শ, আব্বুর কাজ, কত মহান লক্ষ্যের দিকে ধাবিত ছিল ! দেশের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তেই যেন আব্বু দূরে চলে গেল ! কে এখন পথ দেখাবে ? আর তো কোন নেতা নেই ! আব্বু আমার আব্বু।"

স্বাধীনতা উত্তর কালের অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সেদিনের রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্যদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে দেশ যেভাবে চলছে, বঙ্গবন্ধু বাঁচবেন না, ওনাদেরকেও বাঁচিয়ে রাখা হবে না এবং দেশ চলে যাবে গণহত্যাকারী স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির হাতে। ১৯৭৪ সালের শুরু থেকেই তিনি এ কথা বলা শুরু করছিলেন। প্রখর দূরদর্শী, অপ্রিয় সত্যভাষী ও সৎ পরামর্শক তাজউদ্দীন আহমদের সতর্কবাণী ও উপদেশ সেদিন শুধু অগ্রাহ্যই হয়নি ওনাকেই বরং অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে সরে যেতে হয়েছিল। তাজউদ্দীন আহমদের আশংকা ও ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারবর্গ ও জাতীয় চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বাংলাদেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে আসন গেড়ে নেয় সুদীর্ঘ কালের জন্য। যার অশুভ জের আজও চলছে।

শক্তিশালী আন্তর্জাতিক চক্রের যোগসাজশে ১৫ আগস্টে সংগঠিত সামরিক অভ্যুত্থান ও নভেম্বর মাসের জেল হত্যার সাথে জড়িত ছিল সেই বেসামরিক চক্র যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে সিআইএ-পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করছিল এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যাদের ষড়যন্ত্রকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিহত করেছিলেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক প্রয়াত ক্রিস্টোফার হিচিন্স তাঁর সাড়া জাগানো "দ্য ট্রায়াল অফ হেনরি কিসিঞ্জার" গ্রন্থে (২০০১) উল্লেখ করেছেন যে ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কার্নেগি এন্ডাউমেনট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস বেসরকারি সংগঠনটি ১৫০ জনের বেশি স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা ও সিআইএ এজেন্টদের সাক্ষাৎকার নেবার মাধ্যমে গণহত্যার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত হবার বিষয়টি নয় মাসের দীর্ঘ অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টা নেয়। রিপোর্টটি জনসমক্ষে প্রকাশ না করা হলেও সাংবাদিক লরেন্স লিফসুল্টজ সেই রিপোর্ট পড়ার সুযোগ পান। রিপোর্টটিতে ১৯৭১ সালে কিসিঞ্জারের প্ররোচনায় এবং খন্দকার মোশতাকের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিলম্বিত করার উদ্যোগ এবং মোশতাকের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার বিষয়টি উল্লেখিত হয়। লিফসুল্টজ তাঁর নিজের সাড়া জাগানো বই "বাংলাদেশ দ্য আনফিনিশড রেভুলুশন" গ্রন্থেও এ বিষয়ে উল্লেখ করেন যে নিরঙ্কুশ এবং আপসহীন স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে তাজউদ্দীন আহমদের শক্ত অবস্থানের কারণেই কিসিঞ্জার গোপনে বেছে নিয়েছিল খন্দকার মোশতাক ও তার অনুসারীদের। লিফসুল্টজের তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে আরও জানা যায় যে ১৯৭৫ সালে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ডেভিড ইউজিন বোস্টার ওয়াকিবহাল ছিলেন যে মুজিবের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হতে চলেছে। অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে মার্কিন দূতাবাসের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের শেষে রাত ১১ টার দিকে, লুঙ্গি গেঞ্জি পরিহিত তাজউদ্দীন আহমদ কিছু দূর পায়ে হেঁটে ও রিকশায় করে বঙ্গবন্ধুর বাসায় গিয়েছিলেন। উনি তখন শোবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ, ওনার সোর্স থেকে পাওয়া খবরের উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। তাঁর ওপর যে কোনো সময় হামলা হতে পারে। তিনি যেন অবিলম্বে সেনাবাহিনীর দিকে কড়া নজর দেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহকর্মী তাজউদ্দীন আহমদের সতর্কবাণীকে সেদিন আমলে নেননি।

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের অন্যতম পরিকল্পক তদানীন্তন মেজর আব্দুর রশীদ ও মেজর ফারুক রহমান, বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও সামরিক বাহিনীর তদানীন্তন ডেপুটি চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে

বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে জুনিয়র আর্মি অফিসারদের অভ্যুত্থানের বিষয়টি অবহিত করে এবং উভয়ের সমর্থন লাভ করে। (সাংবাদিক এন্থনি ম্যাসকারনহাসের কাছে দেয়া টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তারা একথা জানায়, যা এখন সর্বজনবিদিত) বেসামরিক এবং সামরিক বাহিনীর যোগসাজশে এভাবেই সংঘটিত হয় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। অতি বেদনাদায়ক ব্যাপারটি ছিল যে ১৯৭১ এর স্বাধীনতা বিরোধী ও পাকিস্তান-মার্কিন স্বার্থ রক্ষাকারী মোশতাক-তাহেরউদ্দীন ঠাকুর-মাহবুব আলম চাষী এই পরাজিত চক্রটিই স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজনে পরিণত হয়ে নিজ দলের ভেতর থেকেই ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকে। এরাই ছিল মুজিব হত্যার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী। এরা স্বাধীনতার প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হবে না উপরন্তু এরা আঘাত হানবে স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী আপসহীন নেতৃত্বের ওপর সে বিষয়ে তাজউদ্দীন আহমদের কোনো সন্দেহ ছিল না। এ কারণেই, মন্ত্রিসভায় এবং বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটিতে না থাকলেও ১৫ আগস্ট তাঁকে গৃহবন্দি করা হয়। ২২ আগস্ট যখন তাঁকে বাসা থেকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন আম্মা, বেগম জোহরা তাজউদ্দীন প্রশ্ন করেছিলেন যে কবে তাঁকে ছাড়বে বলে তিনি মনে করেন। আব্বু যেতে যেতেই পেছনে হাত নেড়ে বলেছিলেন "টেক ইট ফরেভার"। তিনি চিরকালের জন্যই চলে যাচ্ছেন।

এক যুগ পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেভেলপমেনটাল সাইকলজির ক্লাসে আমি অধ্যাপক ডঃ গারসিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে স্বপ্ন ভবিষ্যৎ দেখাতে পারে কিনা এবং এর মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া কী ? তিনি আমাকে বলেছিলেন প্যারা সাইকোলজির ওপরে প্রকাশিত গবেষণামূলক লেখাগুলো পড়তে যা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়র অস্তিত্ব সমন্ধে ইঙ্গিত দেয়। (সাম্প্রতিক হাজার তথ্য এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে কোনো ঘটনা ঘটার আগেই হৃদয় তা জানতে পারে এবং হৃদয় হতেই সবচেয়ে বেশি ইনফরমেশন সিগন্যালস মস্তিষ্কে যায়। অর্থাৎ মস্তিষ্ক অধিকতর নির্ভরশীল হৃদয় জ্ঞানের ওপর। সেজন্যই আমরা হয়তো হৃদয় দিয়ে ভালোবাসার কথা বলি,মস্তিষ্ক দিয়ে নয়। এ বিষয়ে জানতে আগ্রহীরা ডক চিলড্রে এবং হাওয়ারড মারটিন প্রকাশিত "দ্য হার্টম্যাথ সল্যুশন" বইটি পড়ে দেখতে পারেন।)

স্বপ্ন যে ভবিষ্যৎ দেখাতে পারে সেই উত্তর আমার জীবনের বেদনার অভিজ্ঞতা থেকে আমি তার আগেই পেয়ে গেছি। পৃথিবীর বহু মানুষও তা উপলব্ধি করেছেন। আমাদের পবিত্র কুরআনসহ প্রায় সব ধর্মগ্রন্থেও স্বপ্নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জ্ঞানের কথা উল্লেখিত হয়েছে। প্রশ্নটি করেছিলাম স্বপ্নের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ সম্পর্কে বিজ্ঞান কী বলে তা জানার জন্য। (আমার এক প্রিয় এবং জগৎ খ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ কার্ল ইউং এর (Carl Jung)

স্বপ্ন-অতীন্দ্রিয়-ভবিষ্যৎ জ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা মনস্তত্ত্ব সহ, জ্ঞানের বহু শাখায় অসাধারণ ও যুগান্তকারী অবদান রেখেছে। তিনি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানকে আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন।)

আব্বুকে জেলে বন্দী করার পরেও আমাদেরকে একমাস গৃহবন্দি করে রাখা হয়। আব্বুর সাথে পুরাতন ঢাকার নাজিমউদ্দীন রোডে অবস্থিত কেন্দ্রীয় কারাগারে দেখা করার অনুমতি মেলে এক মাস পরে। সেপ্টেম্বর মাসে। অক্টোবরে, কারাগারে আব্বুর সাথে আম্মার সাক্ষাৎ হয়। সেদিন তিনি আম্মাকে জানান যে স্বপ্নে তিনি মুজিব কাকুকে (বঙ্গবন্ধুকে আমরা ছেলেবেলা থেকে ঐ নামেই সম্বোধন করতাম) বাগানে তার কাছে আসতে দেখেছেন । আব্বু জেলের ভেতরের পচা একটা নর্দমা ভরাট করে নিজেই কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে অতি মনোরম এক মৌসুমি ফুলের বাগান করেছিলেন। স্বপ্নে সেই বাগানে মুজিব কাকু এসে উপস্থিত। আব্বু যেন তখন খুরপি দিয়ে বাগানে কাজ করছেন। মুজিব কাকু আব্বুকে বলছেন "তাজউদ্দীন সেই ৪৪ সাল থেকেই আমরা একসঙ্গে আছি। এখন আর তোমাকে ছাড়া ভালো লাগে না। তুমি চলে আসো আমার কাছে। "আব্বু বললেন, "মুজিব ভাই আমার অনেক কাজ রয়েছে। আমাকে কেন ডাকছেন ?" মুজিব কাকু উত্তর দিলেন, "আমাদের আর কোনো কাজ নেই। সব কাজ শেষ"।

নভেম্বরের ১ তারিখ, শনিবার। আম্মা একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন। স্বপ্নে দেখেন যে বাঁশের চারটি তাঁবু পাশাপাশি রাখা। আম্মা জিজ্ঞেস করলেন "কাদের এই তাঁবু ?" কে যেন উত্তর দিল, "এই তাঁবুগুলো তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান সাহেবদের জন্য"। স্বপ্নের মধ্যেই আম্মার মনে হলো যে বাঁশের তাঁবু দেখা তো ভালো না। টিফিন কেরিয়ার ভরে আব্বুর পছন্দের খাবার রেঁধে সেদিনই আইনজীবীদের সাথে নিয়ে আম্মা একাই জেলে গেলেন আব্বুর সঙ্গে দেখা করতে। আম্মা, আইনজীবীদের সহায়তায় হাই কোর্টের মাধ্যমে আব্বুর আটকাদেশকে অবৈধ চ্যালেঞ্জ করে আব্বুকে মুক্ত করার জন্য নথিপত্র জোগাড় করেছিলেন। হত্যাকারী সেই আর্মি– মোশতাক সরকার আব্বুকে দুর্নীতিতে জড়ানোর নিরন্তর চেষ্টা করেও দুর্নীতি তো দূরের কথা একটা সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগও দাঁড় করাতে পারেনি। আব্বুকে মুক্ত করার জন্য ৫ নভেম্বর আদালতে রিট পিটিশন ওঠার কথা। আম্মা আব্বুকে সেই খবর জানালেন। কিন্তু আব্বু যেন কেমন চিন্তা মগ্ন রইলেন। তিনি আম্মার ডাক নাম ধরে বললেন "লিলি আজ রাতে ডায়েরির শেষ পাতা লেখা হবে। সেই সঙ্গে শেষ হবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা।" তারপর বললেন "আর বোধহয় বাঁচব না"। জেলে আব্বুর সাথে আম্মার সেই শেষ সাক্ষাৎ।

৩ নভেম্বর, মাত্র ভোর হওয়া শুরু হয়েছে। আব্বু ও তার সহকর্মীদের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে রয়েছে কারাগৃহের মাটিতে। সেই ভয়াল সংবাদটি আমরা জানতে পারব আরও একদিন পরে। আম্মা সেই একই ভোরে স্বপ্নে দেখলেন যে বিস্তীর্ণ মহাকাশে বিচরণকারী মধ্য গগনের সূর্যটি যেন আচমকাই অস্তগামী সূর্যের মতো রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। সিংহাসনের মতো এক আসনে বসা আব্বুর সারা শরীরের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে রক্ত লাল আলো। আব্বুর পরনের সাদা গেঞ্জিটি ক্রমশই লাল হয়ে উঠছে। যেন সূর্য থেকে বের হচ্ছে রক্তের ধারা। আম্মা স্বপ্নের মধ্যেই ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন "মধ্য গগনের সূর্যের রং অস্তগামী সূর্যর মতো লাল রঙের হয় কী করে ?" অদৃশ্য থেকে কে যেন গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল, "দেশের ওপর মহা বিপদ নেমে আসছে"। আম্মা এক অজানা আশঙ্কা নিয়ে দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন। সাত সকালে জঙ্গি বিমানের প্রচণ্ড শব্দে আমাদেরও ঘুম ভেঙে গেল। আমাদের বাসার খুব নিচ দিয়ে জঙ্গি বিমান ও হেলিকপ্টার ঘন ঘন উড়ে যেতে দেখলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে আমার নানা আম্মাকে জিজ্ঞেস করলেন "লিলি এত প্লেন কেন উড়ছে ?" আম্মা বললেন, "অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না। মনে হয় আমাদের বাসা ছাড়তে হবে।" ইতিমধ্যে সকাল সাতটায় রেডিওর অনুষ্ঠান হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে লিভার সিরোসিস রোগাক্রান্ত আমাদের মেজকাকু (আব্বুর পরবর্তী ভাই প্রয়াত মফিজউদ্দীন আহমদ) চিন্তিত হয়ে হয়ে ছোট ফুফুর ছেলে ঢাকা কলেজের ছাত্র বাবুলকে (নজরুল ইসলাম খান) আমাদের বাসায় পাঠালেন কোনো খবর আছে কিনা জানতে। বাবুল সকাল আটটার দিকে আমাদের বাসায় পৌঁছে দেখে আম্মা চিন্তিতভাবে ডাইনিং টেবিলের কাছে বসা। বাবুলকে তিনি ভোর রাতে দেখা স্বপ্নটি বললেন। তারপর অবস্থা ভালো না ঠেকায় আমরা কাছেই ধানমন্ডির ১৯ নম্বর রোডে মফিজ কাকুর বাসায় আশ্রয় নিলাম। সেদিন ঢাকার রাস্তা ঘাট জুড়ে নানা রকম গুজব চলছিল। অনেকেই আম্মাকে বিভিন্ন খবর দিলেন। কেউ বললেন যে আব্বু ও তার সহকর্মীদের জেল থেকে বের করে বঙ্গভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সরকার গঠনের জন্য। কেউ বললেন ওনাদেরকে কোনো গোপন জায়গায় নিয়ে সেখান তাদেরকে চাপ দেয়া হচ্ছে মোশতাকের (অবৈধ) সরকারে যোগ দিতে ইত্যাদি। আম্মা নিজেও মালেকা খালাকে (নারী নেত্রী) নিয়ে ছুটলেন বিভিন্ন জায়গায় সঠিক খবরের আশায়। তখন তো আর সেল ফোনের যুগ নয়, ফোনও সবার বাড়িতে নেই। নিজেদেরই বিভিন্ন জায়গায় যেতে হচ্ছিল সঠিক সংবাদের আশায়।

পরদিন, ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার, সকাল সাড়ে সাতটার দিকে খবর এল আব্বুর বন্ধু ডাক্তার এম. এ করিম আম্মার জন্য অপেক্ষা করছেন মফিজ কাকুর বাসার কাছেই, অ্যাডভোকেট মেহেরুননেসা রহমানের বাসার সামনে। ওনার

কাছে জরুরি খবর আছে। সংবাদ পাওয়া মাত্রই আম্মা আমাকে নিয়ে রিকশায় চেপে বসলেন। রিকশা থামল বাড়ির সামনে। আম্মার সামনে দাঁড়ালেন করিম কাকু। ছোটবেলায় অসুখ বিসুখ হলে আব্বুর এই রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী ও নিঃস্বার্থ সেবক বন্ধু ডঃ করিম ছিলেন আমাদের ভরসাস্থল। ওনার সদা হাস্য চেহারা ও মজার মজার আলাপ শুনে অসুখ অর্ধেক ভালো হয়ে যেত। আজ ওনাকে এমন বিমর্ষ- বেদনাসিক্ত কেন লাগছে ? উনি হাউ মাউ করে কেঁদে বললেন "ভাবি, তাজউদ্দীন ও তাঁর সহকর্মীদেরকে আর্মিরা মেরে ফেলেছে।" খবরটি শুনে আম্মা যেন পাথর হয়ে গেলেন। আম্মার হাত আঁকড়ে ধরে আমি বলে উঠলাম "এ নিশ্চয়ই ভুল খবর !" করিম কাকুর পরিচিত ডাক্তার সেকান্দারের চেম্বার ছিল জেলের কাছেই বকশিবাজারে। তিনি ভোর বেলায় ওনাকে ফোন করে এই মর্মান্তিক খবরটি জানান। তারপরও বিশ্বাস হতে চায় না। যেহেতু সরকারি তরফ থেকে কিছু বলা হয়নি এবং মিডিয়াও নীরব ভূমিকা পালন করছে। সেহেতু আমাদের পক্ষে ঐ হৃদয়বিদারক খবরটি বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। একটা গভীর আতঙ্ক নিয়ে আমরা সারাদিন ছোটাছুটি করলাম সংবাদের আশায়। ততক্ষণে একটা কথা সকলের মুখেই শোনা যাচ্ছিল। গতকাল ভোর রাতে জেলে পাগলা ঘন্টি ও গোলাগুলির শব্দ শোনা গিয়েছে।

বিকেল চারটার দিকে মফিজ কাকুর বাসায় কয়েকজন মহিলা প্রবেশ করলেন। তাদের একজন পরিচয় দিলেন যে তিনি মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফের মা। আম্মা তখনো ফেরেননি। তিনি ফুফাতো ভাই বাবুলকে জিজ্ঞেস করলেন "তাজউদ্দীন সাহেব তোমার কে হয় ?" বাবুল জবাব দিল "মামা হয়"। উনি এবং বাকি মহিলারা বাবুলকে আমাদের থেকে আলাদা করে পাশের ঘরে নিয়ে কী যেন বলেই সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন। তাঁরা যেতে না যেতেই ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল বাবুলের হাহাকার ভরা আর্তনাদ। ছোট বোন রিমি ও মিমিসহ ঘরে ঢুকে দেখি বাবুল একবার বিছানায় ও একবার মাটিতে 'মামা' 'মামা' বলে চিৎকার করে লুটোপুটি খাচ্ছে। খালেদ মোশাররফের মা বাবুলকে দুঃসংবাদটি দিয়ে চলে যাবার পর জানাতে বলেছিলেন।

বঙ্গভবন হতে খন্দকার মোশতাক ও মেজর আব্দুর রশীদের নির্দেশে রাতের অন্ধকারে এই বর্বর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই দুই জন হত্যাকারীদের জন্য জেল গেট খুলে দেবার জন্য কারাগারের আইজিকে হুকুম দেয়। যুক্তরাষ্ট্র হতে ঢাকায় এসে জেল হত্যাকাণ্ডের ওপর তথ্য সংগ্রহের সময় ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক, যাকে খালেদ মোশাররফ জেল হত্যার তদন্তে নিয়োগ করেছিলেন তিনি এই তথ্য আমাকে ১৬ জুন, ১৯৮৭ সালে সাক্ষাতে দিয়েছিলেন। পরে তো ৭ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ নিহত হবার পর এবং জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করে জেল হত্যার তদন্ত বন্ধ করে দেয়। বঙ্গবন্ধু

ও জেল হত্যাকারীরা বরং বিদেশের দূতাবাসে পদমর্যাদা যুক্ত চাকরির মাধ্যমে পুরস্কৃত হয়। মোশতাককে দুর্নীতির দায়ে জেল খাটতে হয়, বঙ্গবন্ধু ও জেল হত্যার মতো জঘন্য অপরাধের শাস্তিকে পাশ কাটিয়ে।

সবচেয়ে বড় বেদনা তক্ষুনি যখন প্রকাশের সব ভাষা হারিয়ে যায় নিমিষেই। কেমন যেন যন্ত্র চালিতের মতোই রিমিকে নিয়ে ফিরে এলাম আমাদের বাসায়। মনে হলো সারাদিন পাওয়া খবরগুলো কোনো অদ্ভুত দুঃস্বপ্ন। জেলে পাগলা ঘন্টি, গোলাগুলি, আব্বু নিহত ! ! ! এবার হয়তো বাসায় কেউ ভালো খবর নিয়ে আসবেন এমনি নিভু নিভু আশায় বুক বেঁধে আম্মার পাশে এসে আমরা দাঁড়ালাম। এক এক করে আম্মাকে ঘিরে মানুষের ভিড় জমে উঠতে থাকল। আম্মা বারান্দার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা। বাকরুদ্ধ। বেদনাক্লিষ্ট। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ময়েজউদ্দীন আহমেদসহ আব্বুর বেশ ক'জন সহকর্মী ও বন্ধু নিয়ে এলেন পাকা খবর। জেলখানায় আব্বু ও তাঁর তিন সহকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। সংবাদদাতাদের দিকে আম্মা তাকিয়ে রইলেন কেমন নিস্পন্দ দৃষ্টিতে। আমি সেই মুহূর্তে ছুটে আব্বু ও আম্মার ঘরে ঢুকে ওনাদের খাটে বসে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কতক্ষণ ওভাবে অশ্রু প্লাবনে সিক্ত হয়েছিলাম জানি না। পানির ঝাপটায় দুঃখ ধুয়ে যায় না, তারপরও বৃথা আশায় বেসিন খুলে সমানে চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিতে থাকলাম। ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখি আম্মাকে ড্রইং রুমের সোফাতে বসানো হয়েছে। এলোমেলো চুলে ঘেরা আম্মার চোখে মুখে কী নিদারুণ হাহাকার ! এক পর্যায়ে আম্মা ডুকরে কেঁদে বললেন, "এই সোনার মানুষটাকে ওরা কীভাবে মারল ! দেশ কী হারাল !"

গভীর রাতে, বড় ফুফুর ছেলে মুক্তিযোদ্ধা শাহিদ ভাইয়ের কাছে জেল কর্তৃপক্ষ আব্বুর মরদেহ হস্তান্তর করে। ৪ নভেম্বর দিবাগত রাত ১২-২৫ মিনিটে, পুলিশের ট্রাকে করে জেলখানা থেকে চির নিদ্রায় শায়িত আব্বু ঘরে ফিরলেন। সঙ্গে ফিরল আব্বুর রক্তমাখা ঘড়ি, জামা, স্যানডেল ও বুলেটে ছিদ্র হওয়া টিফিন ক্যারিয়ার, যাতে করে ১ নভেম্বর আম্মা শেষ খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন। আব্বুর কুরআন শরিফটি যা তিনি জেলে পাঠ করতেন, তা বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল, সেটা আর ফেরত দেবার অবস্থায় ছিল না। আব্বুর মহা মূল্যবান সেই কাল চামড়ায় সোনালি বর্ডার ওয়ালা ডায়েরিটি যাতে তিনি লিখছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কীভাবে চলবে তার দিক- নির্দেশনা, সেটা রহস্যজনকভাবে জেলেই হারিয়ে যায়। [আব্বুর সাথে অন্যান্যদের মধ্যে বন্দী ছিলেন এ.এস.এম মহসীন বুলবুল। ১৯৮৭ সালের ৮ জুলাই যখন সাক্ষাৎকারটি টেপে ধারণ করি, উনি উল্লেখ করেছিলেন যে আওয়ামী লীগের এক নেতা কোরবান আলী, যিনি পরে প্রেসিডেন্ট

এরশাদের দলে যোগ দেন, তিনি, আব্বুর মৃত্যুর পর নিজের কাছে সেই ডায়েরিটি রেখে দিয়েছিলেন এবং লুকিয়ে লুকিয়ে তা পড়তেন। বুলবুল সাহেব আব্বুকে এই ডায়েরিটি লিখতে দেখেছিলেন এবং কৌতূহলবশত ডায়েরিতে কী লিখছেন জিজ্ঞেস করলে আব্বু মাঝে মাঝে ডায়েরিটি থেকে পড়ে শোনাতেন। শনিবার, ১৩ মার্চ, ১৯৭৬ যখন বুলবুল সাহেব জেল থেকে ছাড়া পান, তখন তিনি অনুরোধ করেছিলেন কোরবান আলী যিনি তখনো মুক্তি লাভ করেননি, তিনি যেন ডায়েরিটি তাঁর কাছে দেন, যাতে আম্মাকে তিনি এই মহা মূল্যবান ঐতিহাসিক ডকুমেন্টটি ফেরত দিতে পারেন। কিন্তু কোরবান আলী ডায়েরিটি ফেরত দেয় না। পরবর্তীতে কোরবান আলীর কাছ থেকে ডায়েরিটি উদ্ধারের চেষ্টা করা হলেও লাভ হয়নি। তার মৃত্যুর পর ডায়েরিটির আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।]

আব্বু চিরকালের জন্য মুক্তি লাভ করে ঘরে ফিরে এলেন। ৭৫১ সাত মসজিদ রোডের নিচতলার জলছাদ-ওয়ালা গাড়ি বারান্দার পাশের ঘরটিতে আব্বু শুয়ে রয়েছেন। ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর এই ঘরটিতেই মিলিটারি আস্তানা গেড়ে আমাদেরকে গৃহবন্দি করে রাখে। স্বাধীনতা পূর্বকালে এই ঘরটি আব্বু ব্যবহার করতেন লেখাপড়া, মিটিং ও অফিসের কাজ কর্মের জন্য। অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই ঘরটিতে বসেই আব্বু দেশ পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ তৈরি করেছিলেন। শৈশবে এই ঘরটির জানালার পাশে বসে আমি খেলতাম। আব্বু টেবিলে রাখা মর্নিং নিউজ পত্রিকার পাতা থেকে আমার জন্য কার্টুন জমিয়ে রাখতেন। জানালা-পথে গাড়ি বারান্দার কলাম বেয়ে ওঠা মাধবীলতা ফুল গাছের ঝাড়ে পাখির আনা-গোনা দেখে আমি উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠতাম, "আব্বু, পাখি, পাখি !" আব্বু মিষ্টি হেসে বলতেন, "ঐ পাখির নাম জানো ? ওর নাম তিতির"। ঐ একই ঘরে সেদিন আমরা প্রবেশ করছি। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতি কত ভিন্ন !

৫ নভেম্বর, বুধবার। সূর্য তখনো ওঠেনি। শান্ত ভোর সরব হয়ে উঠেছে অগুনিত মানুষের গুঞ্জরণে। সাত মসজিদ রোডের মাইল খানেক দূর থেকে মানুষের বিশাল লাইন শুরু হয়েছে। শ্রদ্ধাবনতভাবে তাঁরা নিচ তালার ঘরটিতে প্রবেশ করছেন। তাঁদের প্রিয় নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে শৃঙ্খলার সাথে একে একে তাঁরা বেরিয়ে আসছেন। আমি দরজার এক কোণে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। ঐ তো দেখা যায় ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম দরজার কাছে দাঁড়ানো। চোখে অশ্রু টলোমলো। ঐ দেখা যায় অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে "মামা,মামা" (পরিচয় সূত্রে) বলে অঝোরে কেঁদে চলেছেন। ঐ যে একসারি মানুষ চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। কিছু মানুষ চেনা। অধিকাংশই অচেনা। এনারা কারা ? কেন

আসছেন ? আব্বু কি সত্যি নেই ! ছোট্ট সোহেল কেমন অসহায়ের মতো আব্বুর চার পাশে ঘুরে ঘুরে আব্বুকে দেখছে। মাঝে মাঝে আব্বুর মাথার কাছে বসে থাকছে অনেকক্ষণ ধরে। বিমর্ষভাবে মিমি একবার আম্মার কাছে আরেকবার আব্বুর কাছে ঘোরাফিরা করছে। রিমি বলল যে গোসল করানোর সময় সে আব্বুর ডান পায়ের গোড়ালিতে বুলেটের রক্তাক্ত ক্ষত দেখেছে। আমাদের সমবয়সী চাচাতো বোন (মফিজ কাকুর মেয়ে) দীপি দেখল যে বুলেট আব্বুর গোড়ালির এ-পাশ-ওপাশ ফুঁড়ে বেরিয়েছে। আমার শক্তি ছিল না সেই দৃশ্য দেখার। আমাদের দরদরিয়া গ্রামের বারেক মিয়া এবং খালাতো ভাই সাঈদ, গোসল করাতে গিয়ে আব্বুর শরীরের তিন জায়গায় বুলেটের ক্ষত দেখতে পান। একটি ডান পায়ের গোড়ালির সন্ধিস্থলে, দ্বিতীয়টি উরুতে এবং তৃতীয়টি ছিল নাভি থেকে ছয়-সাত ইঞ্চি দূরত্বে, ডান কোমরের হাড়ের পাশে। আব্বুর মৃত্যু নিয়ে ভিড়ের মধ্যে কিছু মন্তব্য আমাদের কানে এল। কেউ একজন বললেন যে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে নাকি উল্লেখ করা হয়েছে যে রক্তক্ষরণে আব্বুর মৃত্যু হয়। অন্য কেউ আপসোস করে বললেন "আহা জেল কর্তৃপক্ষ যদি সঙ্গে সঙ্গেই তাজউদ্দীন ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেন উনি বেঁচে যেতেন।"

দোতালায় ভেতরের বারান্দায় বসা আম্মার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই আম্মা আমার হাত আঁকড়ে ধরে বললেন, "দেখ তোমার আব্বুকে বিদায় দিতে আজ কতজন এসেছে।" জানালাপথে আমগাছের নিচে ট্রাকে শায়িত আব্বুকে ঘিরে থাকা শত শত মানুষের দিকে তাকিয়ে বললেন "যে দেশ, যে মানুষ ছাড়া তুমি কিছু বোঝনি আজ দেখ তোমাকে বিদায় দিতে কত মানুষ এসেছে।"

আর্মি-পুলিশ কর্তৃপক্ষের নানা বাধার মধ্য দিয়ে আব্বুর লাগানো আমগাছের নিচেই, বেলা দেড়টার দিকে, রুগ্ন ও শোকাতুর মফিজ কাকু তাঁর পরম ভালোবাসার "ভাই সাহেবের" জানাজা পড়ালেন। আম্মার পাশে দাঁড়িয়ে আমরা দোতালার জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম। জানাজা শেষে আব্বুকে বহনকারী ট্রাকটি আমাদের "যেতে নাহি দেব হায়" কান্না উপেক্ষা করে ধীরে ধীরে বনানী গোরস্থানের দিকে রওয়ানা হলো। ট্রাকের সঙ্গে সোহেলকে কোলে করে চলে গেলেন মফিজ কাকু। তাঁর সঙ্গে গেলেন ছোট কাকু আফসারউদ্দীন আহমদ, শাহিদ ভাই, সাঈদ ভাই, দলিল ভাই, বাবুল, মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান, খালেদ খুররম, আবু মোহাম্মদ খান বাবলু ও আরও দু-একজন। আর্মি- পুলিশের বাধায় খুব বেশি লোক সেদিন বনানী গোরস্থানে যেতে পারেনি। যারা সেদিন যেতে পেরেছিলেন তারাই বকুল গাছের নিচে আব্বুকে তাঁর শেষ শয্যায় শায়িত করলেন। বড় মামু সোহেলকে ডাকলেন। শিশু সোহেলের হাতে পড়ল তার বাবার কবরের প্রথম মাটি।

আব্বু-আম্মা, রিমি, মিমি ও সোহেলের সাথে হেয়ার রোডের বাসভবনে। মে, ১৯৭৪

আব্বু অমর্ত্যলোকে চলে গেলেন আমাদের হৃদয়কে শূন্য করে। কিন্তু লেই কি চলে গেলেন ? যারা অসীম প্রেমময়- সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার আরাধনাকে ন্তরিত করেন মেহনতি ও নির্যাতিত মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির সংগ্রামে আশা আলোর দিশারী হয়ে অমরত্ব লাভ করেন এ জগতেও।

কোস্তারিকা
১ নভেম্বর, ২০১৩

কন্যার ডায়েরি : রক্তঝরা নভেম্বর

আমি ডায়েরি লেখা শুরু করেছিলাম বারো বছর বয়স থেকে। কৌতূহলকর বা মনকে স্পর্শ করে এমন বিষয় বা ঘটনাগুলোকে লিপিবদ্ধ করতাম আমার গল্প লেখার খাতায়। সে সময় দৈনিক ইত্তেফাকের কচিকাঁচার আসরে আমার লেখা গল্প ছাপা হতো। এক শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁর মা অবলম্বনে আমার প্রথম গল্প 'মা' ছাপা হয়েছিল ১৯৭২ সালে ইত্তেফাকের পাতায়। আমি ডায়েরি লিখতাম ঐ গল্প লেখার খাতায়। আব্বু, আম্মা ও আনার আপা [আমাদের অতি আদরের প্রয়াত ফুফাতো বোন, আব্বু ও আম্মার স্নেহ ছায়ায় বড় হয়েছেন] নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। তাঁরা লিখতেন মলাট-বাঁধানো বা ক্যালেন্ডারযুক্ত ডায়েরির পাতায়। ১৯৭৫ সালে, কালো মলাটওয়ালা ও ছাপার হরফে বাংলা, ইংরেজি ও আরবিতে বছর, মাস, দিন উল্লেখিত একটি ডায়েরি আমি পাই। বছরের শুরুতে অনেকেই আমাদের বাড়িতে নতুন বছরের শুভেচ্ছা স্বরূপ ক্যালেন্ডার, অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক ইত্যাদি পাঠাতেন। ওই ডায়েরিটি সেভাবেই পাওয়া। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে উদ্বেলিত কিশোর হৃদয়কে মেলে ধরলাম আমার নতুন ডায়েরির পাতায়। 'আজকে একটি নতুন জিনিস পেলাম। সেটা হচ্ছে একটি ডায়েরি। আমার জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা, আমি ডায়েরিতে লিখছি। ...অষ্টম শ্রেণী থেকেই আমার নতুন একটা শখ অথবা অভ্যাস গড়ে উঠল, সেটা হচ্ছে, রোজদিন অথবা মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটে যা লিখবার মতো আমি সে সব ঘটনা লিখতাম এবং আমার লিখতে ভালো লাগত। আমার গল্প লেখার খাতাতেই আমি সেসব লিখতাম। সে-সময় ডায়েরিতে লিখবার কথা মনে হয়নি এবং ভাবিওনি যে ডায়েরিতেই এসব লেখা উচিত। ...হয়তো একটা মুভি দেখে এলাম, মুভিটা খুব ভালো লাগল, আমার মনের গভীরে প্রবেশ করল, ঘরে ফিরে আমার ঠিক তক্ষুনি মুভিটা সম্বন্ধে কিছু লিখতে ইচ্ছে করবে আমি তক্ষুনি আমার গল্প লেখার খাতাটি টেনে নিয়ে কিছু লিখতে বসে গেলাম। ...তারপর বহু ঘটনা যা আমার ভালো লেগেছে, দুঃখ লেগেছে,

ইত্যাদি খাতায় লিখতাম। সকালে-দুপুরে-বিকেলে যে সময়ই সময় পেতাম লিখে যেতাম। ...এখন আমার একটি ডায়েরি হয়েছে। তাই আমার বেশ আনন্দ লাগছে, আবার একটু গর্বও হচ্ছে, কেন বল তো ?
(২ ফেব্রুয়ারি, রোববার, ১৯৭৫)

কিশোর বয়সের আবেগ আপ্লুত উচ্ছ্বসিত ভাবনা ! ভোগবাদী যুগের তখনও বিস্ফোরণ ঘটেনি। নতুন বইয়ের গন্ধ, ডায়েরির মলাটের স্পর্শ, রোজার ঈদের চাঁদ দেখার আনন্দ সবই যেন সূচির ভাণ্ডারে খণ্ডিত হতো অমূল্য সম্পদরাজির মতো। সেদিন আমার জীবনের প্রথম ডায়েরিটি পেয়ে আমি আনন্দিত। গর্বিত। তখন কে জানত যে এক স্বপ্ন-পিয়াসী কিশোরী ঐ একই ডায়েরিতে ধারণ করবে তার জীবনের সবচেয়ে বেদনার স্মৃতিকে !

মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারী-দিশারী, আপসহীন, সংগ্রামী নেতা তাজউদ্দীন আহমদের মর্মান্তিক ও অকাল-মৃত্যুকে তাঁর কন্যা গেঁথে রাখবে রক্তাক্ষরে তার প্রথম পাওয়া ডায়েরিতে !

লেখিকার ডায়েরি থেকে
৩ নভেম্বর, সোমবার, ১৯৭৫ ইংরেজি
১৮ কার্তিক, ১৩৮২ বাংলা
২৭ শওয়াল, ১৩৯৫ আরবি

আজ সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। ভাবলাম যাব না। কিন্তু তারপর ভাবলাম যাই। তারপর যেই নাস্তা খেতে যাব আম্মা এসে বলল আমার স্কুল যাওয়া হবে না। বাইরে খুব গোলমাল লেগেছে। বাসা ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি তো শুনে বেশ হতভম্ব হয়ে গেলাম। প্রথমে ভাবলাম বিশেষ কিছু না। কিন্তু তার পরই দেখলাম অবস্থা সুবিধার নয়। আমাদের বাসার একদম নিচ দিয়ে দু'বার করে হেলিকপ্টার উড়ে গেল। তারপর ফাইটার জেট ঘনঘন উড়ে যেতে লাগল। আম্মা, রিমি, মিমি দেখি ততক্ষণে সব কিছু গুছিয়ে প্রস্তুত। আমি তখন জামাকাপড় একটা ব্যাগে ভরলাম। তারপর আমরা নানাসহ, মফিজ কাকুর [আব্বুর সহদর, পরিবারসহ আমাদের সাত মসজিদ রোডের বাড়ির কাছে, ধানমন্ডির ১৯নং রোডে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। ১৯৭৭ সালের ২৮ জুলাই লিভার সিরোসিস রোগাক্রান্ত মফিজ কাকু পরলোক গমন করেন] বাসায় এসে উঠলাম। আম্মা লালু ফুফুর (অ্যাডভোকেট

মেহেরুননেসা) বাসায় ছিল দুপুর পর্যন্ত। ওখানে অনেক খবর টবর এসেছে। এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। মফিজ কাকুর বাসায় আছি। কবে বাসায় যাব ঠিক নেই।

৫ নভেম্বর, বুধবার, ১৯৭৫
২০ কার্তিক, ১৩৮২
২৮ শাওয়াল, ১৩৯৫

আমার জীবনে এ কী ঘটে গেল ? কেন এমন ঘটল ? আব্বু আর নেই, এ পৃথিবী ছেড়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। গতকাল সকাল থেকেই শুনছিলাম আব্বুকে নাকি রোববার রাতে জেলে ঢুকে গুলি করে মেরেছে। আমি বিশ্বাস করিনি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। ভেবেছি আব্বুকে মারবে কেন ? মারবে কেন ? আব্বু তো দেবতা ! হাসান ভাই ও আমি পাগলের মতো রিকশায় চড়লাম। আব্বুর খবর শুনলাম। আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। বাসায় এলাম, ঘরে গেলাম। চিৎকার করে সবার আড়ালে কাঁদলাম। কাঁদবার পর যেন পথ দেখতে পেলাম। আব্বু যেন হাসছেন, বলছেন 'চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে' ! মনকে শক্ত করলাম। যতক্ষণ লাশ না দেখেছি, বিশ্বাস করতে পারিনি। লাশ এল, দেখলাম। সবার সাথে কাঁদলাম। তারপর থেকে আমার এ কী হলো, চোখে যে জল আসছে না ! আমি পাথর হয়ে গেছি, আম্মার দিকে তাকিয়ে মনকে পাষাণ বেঁধেছি। আমরা শুধু আব্বুকে হারাইনি, সারা দেশের একটা সম্পদ হারিয়েছি। অমানুষিক হত্যা ! জেলে ঢুকে রাতের বেলা পশুর মতো গুলি করে মেরেছে ! আব্বু তো মরেনি, ঘুমিয়ে আছে সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের অন্তরে। আব্বুর আদর্শ, আব্বুর কাজ কত মহান লক্ষ্যের দিকে ধাবিত ছিল ! দেশের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তেই যেন আব্বু দূরে চলে গেল ! কে এখন পথ দেখাবে ? আর তো কোনো নেতা নেই !
আব্বু আমার আব্বু !

৭ নভেম্বর, শুক্রবার, ১৯৭৫
২২ কার্তিক, ১৩৮২
২ জিলকদ, ১৩৯৫

রাতে খাবার পর আমি, আম্মা, রিমি, মিমি, সোহেল মধ্যের ঘরে এবং ছোট কাকু, হাসান ভাই ও ভুলু ভাই আমার ঘরে শুয়ে পড়ল। রাত ১টার দিকে হঠাৎ ছোট কাকু দরজা ধাক্কা দিল। আম্মা উঠে খুলে দিল আর সঙ্গে সঙ্গেই সারা

বাড়ি গুলির শব্দে কেঁপে উঠতে লাগল। [কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে ঢাকা সেনানিবাসে সিপাহী অভ্যুত্থান] শেল, কামান দাগার আওয়াজে আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলাম। পাগলের মতো যে যেমন কাপড় পরা ছিলাম তা পরে নিচে নেমে এলাম। তারপর মাথা নিচু করে বেবীদের বাসা দিয়ে দিশেহারা হয়ে সবাই নীরব জনশূন্য রাস্তা দিয়ে মফিজ কাকুর বাসার দিকে দৌড়ুতে লাগলাম। ভুলু ভাই সোহেলকে নিয়ে দৌড়িয়ে আসছিল। আমি টেলিফোনের তারের সাথে একটা ভীষণ ধাক্কা খেলাম। তারপরই আবার রাস্তা ধরে ছুটে মফিজ কাকুর বাসার সামনে দাঁড়ালাম। গেট তালা বন্ধ। আম্মা, আমি, রিমি, হাসান ভাই, মিমি সবাই গেট টপকে ভেতরে এলাম। আমার হাত পা আতঙ্কে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। আমার সব শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল।

১৪ নভেম্বর, শুক্রবার, ১৯৭৫
২৯ কার্তিক, ১৩৮২
৯ জিলকদ, ১৩৯৫

আপাতত এখন বড় মামার বাসায় [রাজাবাজারে, ব্যবসার কারণে বড় মামু তখন ঢাকা চিটাগং যাতায়াত করতেন] থাকতে হবে। পরে বড় মামা এসে আমাদের চিটাগং নিয়ে যাবে ১৫/১৬ দিনের জন্য। টাকা-পয়সার এখন তো বেশ সমস্যা। কবে যে সেটেল হব তারও কোনো ঠিক নেই। আব্বুর চল্লিশার আগে আমাদের বাসায় (৭৫১ সাত মসজিদ রোড, ধানমণ্ডি) চলে যাব, ওখানে থাকব। ধানমণ্ডির বাসা ভাড়া দেবে, এত দুঃখ লাগছে এ-জন্য কিন্তু না দিয়েও তো কোনো উপায় নেই, টাকা আসবে কোথা থেকে ! আব্বু যে চলে গিয়েছে আমি কিছুতেই অনুভব করতে পারি না। মনে হয় বিদেশে গিয়েছে। রাতের বেলা ঘুম ভাঙলে মনে হয় সবই তো ঠিক আছে কিন্তু তারপরই মনে হয়—না, সমস্ত জীবনের গতিটাই ওলোটপালট হয়ে গিয়েছে যার কোনো স্থিতি নেই। মানুষের জীবনটা কী ? অথচ তাই নিয়ে মানুষের মতো গর্ব, এত অহঙ্কার !

১৯ নভেম্বর, বুধবার, ১৯৭৫
৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৮২
১৪ জিলকদ, ১৩৯৫

আজ সকালবেলায় আম্মার সাথে (বড়) মামিসহ বাসায় গেলাম। [জেল হত্যাকাণ্ডের পর, নিরাপত্তার কারণে প্রায় আড়াই মাস আমরা বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলাম] সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা

পুলিশ যখন-তখন আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে হেনস্থা করত। গিয়ে আমার কী যে ভালো লাগল বলবার নয়। আবার কষ্টও লাগল। কত শত স্মৃতিতে ভরা আমাদের বাসা। আর নিজের বাসার মতো এত মধুর কিছু পৃথিবীতে নেই। আমার রুম খুলে আমি বিছানায় বসেছিলাম অনেকক্ষণ। আব্বুর কথা বারবার মনে পড়ছিল। জীবন্ত মানুষ আজ স্মৃতি হয়ে গেল কত তাড়াতাড়ি।

আমার বইগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে আদর করলাম। ওরা আমার প্রাণ। প্রত্যেকটা বই আমার কত কষ্টের জমানো। ওগুলো আমায় কত জ্ঞান দিয়েছে। যার জন্য ওরা আমার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো বন্ধু। বাসায় এসে খেতে বসলাম চারটায়। ছোট কাকু ও হাসান ভাই এসেছিল। সন্ধ্যায় সাঈদ ভাই, আনার আপা, রিমি, মিমি এল। তারপর যাওয়ার সময় সোহেলকে* নিয়ে গেল।

* একমাত্র ছোট ভাই সোহেল তখন ৫ বছরের শিশু মাত্র।

২১ নভেম্বর, শুক্রবার, ১৯৭৫
৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৮২
১৬ জেলকদ, ১৩৯৫

আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাসায় ছিলাম। অনেক ফকির আজ খেয়েছে। আম্মা বাসায় গিয়ে আব্বুর রুমে ঢুকে কেঁদে ফেলেছিল। আব্বুর স্মৃতিতে ভরা ঘর-বারান্দার প্রতিটি স্থান কেমন করে ভোলা যায় সে কথা ! আম্মার অবস্থা দিনদিন খারাপ হচ্ছে। বিশেষ করে কাল থেকে। জেলখানা থেকে আব্বুর রক্তমাখা স্যান্ডেল, জামা ফেরত পাঠিয়েছে। আম্মা ওগুলো দেখেছে। আব্বুর রক্তমাখা ঘড়ি, জামা, স্যান্ডেল দেখে আম্মা সারারাত কেঁদেছে। আম্মাকে কী বলে আজ সান্ত্বনা দেব। ঈদের পর আমরা আম্মাকে নিয়ে চিটাগাংয়ে বড় মামার আর একটা বাসায় যাব। তাতে করে ওখানে থাকলে আম্মার মনটা হয়তো ভালো থাকবে। আব্বু কত তাড়াতাড়ি স্মৃতি হয়ে গেল ! আকাশে যখন লক্ষ তারা মিটিমিটি করে হাসে, তখন মনে হয় ঐ একটি তারার মধ্যেই আব্বু হাসছে ফিকফিকিয়ে।

শারমিন আহমদ
প্রকাশিত : ঠিকানা : যুক্তরাষ্ট্র
৬ নভেম্বর, ২০০৯

কবিতার পটভূমি

প্রতিটি লেখা ও কবিতার একটি পটভূমি থাকে। ৩ নভেম্বর বাবাকে মনে করে কবিতাটির পটভূমি হলো ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বর যখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের তথাকথিত নিরাপত্তার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালা লঙ্ঘন করে, আমার বাবা তাজউদ্দীন আহমদ যিনি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রীরূপে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, তাঁকে ও তাঁর তিন সুযোগ্য সহকর্মী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। রাতের অন্ধকারে, ঘাতকের গুলিতে তাঁরা প্রাণ হারান। ওই হৃদয়-বিদারক ঘটনার পর আমার মা সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন, যাঁর শাড়ির আঁচল হতে তখনও রক্তের দাগ মুছে যায়নি, তিনি সারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম অব্যাহত রাখলেন। বিলুপ্ত আওয়ামী লীগে নব জীবন দান করলেন নিজস্ব আরাম আয়েশ, আহার, নিদ্রা ত্যাগ করে। ওই মর্মান্তিক ঘটনার সময় আমরা তিনবোন ও একমাত্র ভাই স্কুলে পড়ি। সর্বকনিষ্ঠ ভাই, তানজিম আহমদ সোহেল তাজ [গাজীপুর হতে নির্বাচিত সাবেক সাংসদ] তখন পাঁচ বছরের শিশু মাত্র। সেই দুঃখের স্মৃতিভরা বছরটির প্রায় আট বছর পর আমার প্রথম সন্তান তাজের জন্ম। তখন অনেকেই আফসোস করে বলেছিলেন যে আমাদের বাবা আমাদের বড় হওয়া, বিয়ে হওয়া, সন্তানের জন্ম কিছুই দেখে গেলেন না।

সে-সময় হতে আমার মনে সেই কৈশোর কালের প্রশ্নটি আবারও উদিত হয়। আব্বু কি সত্যই চিরঞ্জিবী ? আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান বা quantum physics [নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তাঁর পাইওনিয়র এবং পরবর্তীতে আইনস্টাইন স্থান, সময়, শক্তি ও জড়ের [Space-time-energy-matter] সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানে নতুন মাত্রা যোগ করেন। বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ক্রমশই কাছাকাছি হতে থাকে] অনুসারে শক্তি ও জড়

পদার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শক্তির ক্ষয় নেই। তার রূপান্তর শুধুমাত্র ঘটে। শক্তি বা এনার্জি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ঘিরে রয়েছে। আমাদের দেহের একশো ট্রিলিয়ন জীবকোষে যে শক্তি বিরাজমান এবং অণু ও পরমাণুর অন্তস্তলে রয়েছে যে শক্তি, তার বিনাশ নেই। সে অর্থে দেহের ক্ষয় হলেও শক্তির মৃত্যু নেই। সব শক্তির আধার যে মহাশক্তি তার মহাপরিকল্পনারই অংশ হলো আত্মা নামের উচ্চ চেতনা-সম্পন্ন শক্তি, যা একদিন ক্ষুদ্র দৈহিক জীবনের সীমিত গণ্ডি ত্যাগ করে চির-ভাস্বর হয়ে রয় অনন্ত জীবনে। মানব জীবনের রূপান্তর ঘটে ভিন্ন মাত্রায়। ভিন্ন লোকে।

আমার কৈশোরে বাবার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে হৃদয়ে যে মর্মান্তিক আঘাতটি পেয়েছিলাম সেটা এবং আমার সহজাত কৌতূহল, জীবন, মৃত্যু, স্রষ্টা, সৃষ্টি ও অবিনশ্বর আত্মা বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দেয় এবং ধাপে ধাপে বিবর্তিত হতে থাকে। অন্ধ বিশ্বাস নয়। বরং আলোচনা পর্যালোচনা, গবেষণা ও নিজ অন্তর্দৃষ্টির আলোকে যে উত্তর খুঁজে পাই তা বলে :

"হ্যাঁ, আত্মা অমর। অবিনশ্বর। চির জ্যোর্তিময়।"

তদুপরি বাবার মতো এমন মহৎ মানুষ এবং সেই মানুষেরা যাঁরা অকাতরে ভালোবেসেছেন দেশ ও দশকে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে প্রাণ দিয়ে গেলেন দেশ, দশ ও উচ্চ আদর্শকে ভালোবেসে, তাঁরা তো অমর হবেনই। পরবর্তীকালে আমার ওই উপলব্ধি বোধ হতেই বিকশিত হয় এই কবিতাটি।

দৈনিক জনকণ্ঠ : ঢাকা
শুক্রবার, ২১ কার্তিক ১৪১১ বাংলা

৩রা নভেম্বর : বাবাকে মনে করে

বাড়িতে যখন অতিথি এল
কর্তার খোঁজ পড়ল না।
হৈ চৈ আর হাস্য লাস্যের মধ্যে
নতুন অতিথির হলো বন্দনা।
তখনো খোঁজ নেই কর্তার।
দিঘির পাষাণ ঘাট নিঃশব্দ
কোনো পদশব্দে আর চমকেও উঠল না
শন শন কোনো প্রাচীন শালবন
গুঁড়ির আড়ালে লুকানো সোনালি পত্ররাশির জঞ্জাল
সরিয়ে আকাশ পাতাল ভাববে যে
সেই মানুষটাই হঠাৎ নিখোঁজ !
নতুন অতিথি হাঁটছে টলোমলো করে
বাড়িভরা কর্তার ছবি ধরে তার টানাটানি
আর একটা-দুটো বুলি ফুটছে ভীষণ রকম।
যদি এ অতিথি জানত অদৃশ্যের খবর
শুনলেও হয়তো বা শুনতে পেত
কর্তার ফের সেই উদীপ্ত আনাগোনা প্রতিদিন।
ফুলের বনে উত্তাল দীর্ঘশ্বাসের শব্দে
এখানে ওখানে তার বিমূর্ত উপস্থিতি
ছড়ানো রয়েছে পুরো ঘর-মাঠ ভরা ॥

প্রথম প্রকাশ : সাপ্তাহিক সচিত্র সন্ধানী : ঢাকা
১৯৮৪

৩ নভেম্বর : কালরাতের রক্তশিখা

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধা সাঈদুর রহমান প্যাটেলের সাথে আমার প্রথম ফোনালাপ ও পরিচয় ঘটে ২৩ জুলাই, ২০১১তে আব্বুর ৮৬তম জন্মবার্ষিকীর দিনটিতে। মিশরের জাতীয় বিপ্লব দিবসও উদযাপিত হয় ঐ একই দিনে।

১৯৭৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের নিউ জেল বিল্ডিংএ জাতীয় চার নেতার সঙ্গে বন্দী ছিলেন। বেশ ক'বছর আগে জেল হত্যা দিবসের এক স্মরণসভায় সেই মর্মান্তিক দিনটির প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন। বক্তব্যটির একটি প্রতিবেদন নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'ঠিকানা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই সূত্রে ওনার নাম জানতে পারি এবং ক্যালিফোর্নিয়া আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা তওফিক খান তুহীনের মাধ্যমে ওনার ফোন নাম্বার যোগাড় করি। শুরু হয় পরিচয় ও জেল হত্যা সম্পর্কে আলাপ।

ঢাকার গেণ্ডারিয়া হাইস্কুলের ছাত্র প্যাটেল রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন ১৯৬৬ সাল থেকে। ১৯৬৮ সালে তিনি ঢাকা নগর পূর্বাঞ্চল ছাত্রলীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ঐতিহাসিক বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতি (স্বাধীন বাংলা ফুটবল টিম নামেও ব্যাপক পরিচিত) প্রতিষ্ঠা করেন। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ওনাকে বন্দী করা হয়। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের নিউ জেল বিল্ডিংয়ের ৩নং কক্ষে তিনি, মনসুর আলী, আবদুস সামাদ আজাদ, বঙ্গবন্ধুর বোনের জামাই সৈয়দ হোসেন ও অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে কারাবন্দি ছিলেন। পাশের ২নং কক্ষে ছিলেন কামরুজ্জামান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ১নং কক্ষে তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আসহাবুল হক, কোরবান আলী, আব্দুল কুদ্দুস মাখন এম.পি, দেলওয়ার হোসেন প্রমুখসহ মোট আটজন নেতা থাকতেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ওনাদেরকে বন্দী করা হয়। ফোনালাপে ওনার কাছ থেকে জানতে পারি সেই ভয়াল রাতের ঘটনা।

বঙ্গবন্ধুর পাশে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ ও এম. মনসুর আলী

৩ নভেম্বর রাত (সোমবার) ৩-১৭ মিনিটে প্যাটেল শুনতে পান পাগলাঘন্টির আওয়াজ। কাঁসার ঘন্টি গম্ভীর শব্দে ঢং ঢং করে বাজছিল। একই সাথে করুণ সুরে বিউগল ও ক্ষণে ক্ষণে হুইসেলের শব্দে নিশীথ রাতটা কেমন যেন আতঙ্কপূর্ণ হয়ে উঠছিল। সামাদ আজাদ সাহেব একজন পাহারারত সিপাইকে জিজ্ঞেস করলেন 'মিয়া সাব কী হয়েছে ?' সিপাই জানাল যে সেও কিছু জানে না। তারপর ঝনঝন চাবির শব্দে ১নং রুমের দরজা খোলার শব্দ ওনারা পেলেন। প্রধান সুবেদার জব্বার খানের কাছে লক আপের চাবির গোছা থাকত। এরপর ২নং রুমের লক আপ খোলার শব্দ পেলেন। প্রথম রুম থেকে ততক্ষণে কোরবান আলী, আব্দুস কুদ্দুস মাখন এম.পি., দেলওয়ার হোসেনসহ মোট ৬ জনকে সবচাইতে বড় প্যাটেল সাহেবদের ৩নং রুমে ঢোকানো হয়েছে। মনসুর আলী ওজু করে পাঞ্জাবি পরলেন। দাড়িওয়ালা এক পাহারাদার নায়েব আলী মনসুর আলীর কোমরে ধাক্কা দিয়ে তাগাদা দিল ১নং রুমে

যেতে। মনসুর আলী চলে যাবার সময় প্যাটেল ওনাকে ভরসা দিতে গিয়ে বললেন, 'চাচা, আপনি যান। ওরা বোধহয় সিগনেচার নিতে এসেছে।' মনসুর আলী সাহেব তখন প্যাটেলের দিকে এমন এক করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন যা বর্ণনার অতীত। উনি বুঝতে পেরেছিলেন ঐটাই তাঁর শেষ যাওয়া। প্যাটেলের ভাষায় 'মনসুর আলীকে ১নং রুমে নেওয়ার ১/২ মিনিটের মধ্যেই চারটা স্টেনগানের ম্যাগাজিন ছুটল। ৫টা সিঙ্গেল রাউন্ড গুলির আওয়াজও পেলাম। পরে শুনেছি যে জেলখানার ঐ পাহারাদার নায়েব আলী দৌড়ে গিয়ে হত্যাকারী আর্মিদের বলেছে 'একটা কিন্তু বাইচা আছে।' মনসুর আলী নাকি তখনও বেঁচে ছিলেন ও পানি পানি বলে কাতরাচ্ছিলেন। আর্মিরা গাড়ির কাছ থেকে আবার ভেতরে এসে বেয়নেট চার্জ করে মনসুর আলীকে। চোখের পানি সামলাতে সামলাতেই সাক্ষাৎকার নিতে থাকি। ফোনের ওধার থেকে শুনতে পাই প্যাটেল সাহেবের বেদনাসিক্ত গলার স্মৃতিচারণ।

১৫ আগস্ট বিকেল ৫টার দিকে প্যাটেল সাহেব ফোন করলেন। জানালেন যে জেলহত্যাকাণ্ডের কিছুদিন আগে আব্বুর সাথে বিশেষ কিছু কথোপকথন, যা ওনার স্পষ্ট মনে পড়ে, আমার সাথে শেয়ার করতে চান। আমি সেই মুহূর্তে বাঁধাছাদায় ব্যস্ত। সুদীর্ঘ ২৭ বছর উত্তর আমেরিকার মেরিল্যান্ড স্টেটে প্রবাস জীবনযাপনের পর পাড়ি জমাচ্ছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সামরিক বাহিনী-বিহীন কোস্তারিকা রাষ্ট্রে। আমার স্বামী জীবনসাথি আমর খাইরি আবদাল্লা ভাইস রেক্টর ও প্রফেসার হিসেবে কর্মরত কোস্তারিকায় স্থাপিত জাতিসংঘ ম্যান্ডেটেড ইউনিভার্সিটি ফর পিসে। আমি মুভ করছি শুনে প্যাটেল সাহেব বললেন যে মুভ করার পর উনি আব্বুর সাথে কথোপকথনের বিষয়টি বলবেন। ততক্ষণে আমি বাঁধাছাঁদার কাজ ফেলে কাগজ-কলম হাতে নিয়ে বসেছি। অমূল্য স্মৃতিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কাছে ফেলে না রাখাই শ্রেয়। আবার এক ঐতিহাসিক দিনে লিপিবদ্ধ করলাম কালের হিরণ্যগর্ভ হতে উত্তোলিত ইতিহাসকে। ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস; কোস্তারিকায় মাতৃভাষা দিবস এবং ক্যাথলিক চার্চের মাতা মেরীর স্বর্গারোহণ দিবস; সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মদিন ; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের দিন ও জাতীয় শোকদিবস। ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, আমার জন্মদিনে তরুণ রাজনৈতিক নেতা আ.স.ম আবদুর রব ওনার উপহার দেওয়া রবি ঠাকুরের গল্পগুচ্ছর পাতায় লিখেছিলেন, 'রিপি, আজ তোমার জন্মদিন। কারো মৃত্যুদিন। বড় হয়ে মনে রেখো।'

আব্বুর ইঙ্গিতবাহী স্বপ্ন

প্যাটেল সাহেবের ভাষায় নিম্নোক্ত বিবরণটি ধারণ করা হলো :

১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের ১ তারিখ। বিকেল বেলা। তাজউদ্দীন সাহেব ঢাকার সেন্ট্রাল জেলের নিউ জেল বিল্ডিং-র ১ নম্বর রুমের দরজার সামনে লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে দাঁড়ানো। আমরা তখন বাইরে হাঁটছিলাম। ওনাকে দেখে আমরা সালাম দিয়ে দাঁড়ালাম। মনে হলো যে উনি যেন কিছু বলতে চাচ্ছেন। তাই আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সাথে মাখন ভাই ও বোধহয় ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক হাসিমুদ্দীন পাহাড়ীও ছিলেন। তাজউদ্দীন সাহেব কথা বলার সময় এক হাত মুখের কাছে এনে কথা বলতেন। '৭১-এ মুজিবনগরে যখন দেখা হয় তখনও ওনার এই অভ্যাসটি লক্ষ করেছিলাম। উনি এক হাতের আঙুল মুখের সামনে ধরে ও অন্য হাত পেটের ওপর নাভির কাছে রেখে আমাদের বললেন, 'আমার মনটা বেশ খারাপ। পরপর দুইবার বঙ্গবন্ধুকে স্বপ্নে দেখলাম। প্রথম স্বপ্নে দেখি বঙ্গবন্ধু আমাকে ডাকছেন। [আম্মার সাথে ঐ একই দিন, ১ নভেম্বর জেলে খুব অল্প সময়ের সাক্ষাৎকারে আব্বু প্রথম স্বপ্নটির উল্লেখ করেছিলেন।] আর গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে আমি ৩২নং রোডে ওনার বাড়িতে গিয়েছি। বঙ্গবন্ধু আমাকে হাত ধরে ওনার কালো মার্সিডিজের মধ্যে বসিয়ে বললেন, 'চলো টুঙ্গিপাড়ায় যাই।' দ্বিতীয় স্বপ্নটি দেখে উনি খুব বিচলিত বোধ করেন। উনি বলেন, 'এই স্বপ্ন খুব একটা ভালো ইঙ্গিত করে না।' তাজউদ্দীন সাহেব খুব প্র্যাক্টিকাল মানুষ ছিলেন। স্বপ্ন বা অলৌকিক কাহিনি তিনি সহজে বিশ্বাস করতেন না। অথচ দেখলাম যে ঐ স্বপ্নগুলো তিনি খুব সিরিয়াসলি নিয়েছেন। একটা কথা তিনি শুধু আমাকে বলেছিলেন। বোধহয় তখন অক্টোবরের শেষের দিক। আমরা সেলের চতুর্দিকে হাঁটার পাকা রাস্তায় হাঁটছিলাম। আমরা বন্দী অবস্থায় এক্সারসাইজ করতাম, আসন করতাম, ব্যাডমিন্টন খেলতাম ও হাঁটতাম। এভাবে সময় কাটাবার চেষ্টা করতাম। সেদিনও তাজউদ্দীন সাহেব ও আমি হাঁটছিলাম। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। সেদিনও খুব আদর করে বললেন, 'কি খুব মন খারাপ ?' আমি বললাম, 'বঙ্গবন্ধু চলে গিয়েছেন। কিন্তু আপনারা লিডাররা তো আছেন। আমাদের মনোবল এখনও রয়েছে।' আমি ওনাকে কখনো লিডার বা নেতা সম্বোধন করতাম। আব্দুস সামাদ আজাদকে

সামাদ ভাই ডাকতাম। আমার উত্তরের পর উনি বললেন, 'আশা করি তোমরা ডিসেম্বরের মধ্যে বের হয়ে যাবে। কিন্তু দেশের একটা ভয়ংকর পরিস্থিতি হতে পারে। আমাদের সাবধান থাকতে হবে।' তাজউদ্দীন সাহেব চলে গেলেন বহুদিন হলো। কিন্তু ওনার সাথের অমূল্য স্মৃতি ও কথাগুলো এখনো মনে স্পষ্ট।

টেলিফোন সাক্ষাৎকার : ম্যারিল্যান্ড-ক্যালিফোর্নিয়া
২৩ জুলাই ও ১৫ আগস্ট, ২০১১
প্রকাশিত, ঠিকানা : নিউইয়র্ক
৪ নভেম্বর, ২০১১

আব্বুর অমর বাগান : সাদা শেফালী ও রক্তজবার অর্ঘ্য

৩ নভেম্বর জেল হত্যাকাণ্ডের শোকাবহ দিনটিতে প্যাটেল সাহেবের আরও একটি ছোট সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। উনি বললেন, আজকের দিনে চার নেতার কথা খুব মনে পড়ছে। এই দিনের স্মরণে দুটি বিশেষ বিষয় জানাতে চাই।

প্রথম স্মৃতিটি তাজউদ্দীন সাহেবকে কেন্দ্র করে। উনি জেলখানার একপাশের পচা নর্দমা ও ইটপাথরে ভরা জায়গা পরিষ্কার করে বাগান করেছিলেন। উনি একজন কৃষকের মতোই দক্ষ হাতে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতেন। ওনাকে বাগানে কাজ করতে দেখে আমরাও ওনাকে সহায়তা করতাম।

ওনাদেরকে [চার নেতাকে] হত্যার পর কুষ্টিয়া জেলার বিশিষ্ট নেতা ডা. আসহাবুল হক, তাজউদ্দীন আহমদের নিজ হাতে গড়া ফুলের বাগানে চারটি রক্ত-লাল জবা ফুলের গাছ লাগান, চার নেতার স্মরণে। আমি সাদা শেফালী ফুলগাছ লাগাই। উনি বললেন যে ঐ গাছে ফুল হতে তো কয়েক বছর লেগে যাবে। আমি বললাম, 'হয়তো আমার সযত্নে গড়া ঐ গাছে ফুল দেখে যেতে পারব।' সত্যিই তাই হলো। আমাকে দীর্ঘ ছয় বছর কারাগারে আটক রাখা হয়। সেই সুদীর্ঘ সময়ে তাজউদ্দীন সাহেবের বাগানটির চারপাশ ও ইটের দেওয়াল জুড়ে লাগানো শেফালী গাছ ভরে গেল অজস্র ফুলে। আমি সত্যই চার নেতার স্মরণে লাগানো গাছে ফুল দেখে যেতে পারলাম।

কোস্তারিকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে টেলিফোন সাক্ষাৎকার
বৃহস্পতিবার, ৩ নভেম্বর, ২০১১

৩ নভেম্বরের জেল হত্যা

নিম্নে উল্লেখিত টেপরেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণের সময় আমার মা সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন আমার সাথে ছিলেন। তিনি নিজেও সাক্ষাৎকারগুলোতে মূল্যবান মতামত ও তথ্য দিয়েছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৭২-৭৩) আব্দুস সামাদ আজাদের বাসভবনে ওনার সাক্ষাৎকার।

কলাবাগান, ঢাকা

৫ জুলাই, ১৯৮৭

ট্র্যান্সক্রাইব : শারমিন আহমদ

সিরিজ ১

শারমিন আহমদ : ১৯৭৫ সালের কোন সময় আপনি জেলে যান ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর আমাকে ইন্টার্ন করে রাখল। তার বোধ হয় ৭ দিন পর, যতদূর মনে হয় শবেবরাতের রাত ছিল– নামাজ পড়েছি সারারাত, রোজাও রেখেছি। সকাল বেলা সূর্য তখনো উদয় হয়নি, হঠাৎ পিয়ন এসে বলল 'একজন অফিসার এসেছে'। সাথে দেখি আরও অফিসার এসেছে। তারাও ঘুম থেকে উঠে এসেছে। তারাও ঘটনা উপলব্ধি করতে পারছে না। তারা বলল 'স্যার আপনাকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে।' আমার সন্দেহ হলো। এর আগেও ঘটনা হয়েছে দুই একটা। আমি বললাম 'আমি কাপড় চোপড় চেঞ্জ করে আসি'। তারা বলল যে 'আরও নেতাদের নেওয়া হবে তো সেই ভাবেই আসেন'। আমি তখন একটা ব্যাগে কাপড় চোপড় ভরে আসলাম। আমাদের বাড়ির কাছেই সোহরাওয়ারর্দি উদ্যানে তারা একটি কন্ট্রোল রুম করেছে। সেখানেই তারা নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখি সৈয়দ নজরুল ইসলাম,

মনসুর আলী, কামরুজ্জামান সাহেব...ও আরও কিছু লোক অন্য রুমে আছে। আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। মোট ২৬ জন লোক। ১০ মিনিট পর দেখি তাজউদ্দীন সাহেব আসলেন।

শারমিন আহমদ : দিনটি ২২ আগস্ট ছিল ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : হ্যাঁ ২২ আগস্ট। তো তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আমরা দুজন আলাপ করলাম। কেন এনেছে, কী ব্যাপার– উনি তো ক্যাবিনেটেও ছিলেন না। [দল ও সরকার পরিচালনা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে মতবিরোধের কারণে তাজউদ্দীন আহমদ ২৬ অক্টোবর, ১৯৭৪ অর্থমন্ত্রীর পদ হতে ইস্তফা দেন] একটু পরেই ডালিম [মেজর শরিফুল হক ডালিম।] আসল। কামরুজ্জামান সাহেবের সাথে কথা বলে গেল। তখন কামরুজ্জামানকে জিজ্ঞেস করলাম 'এ কে ?' বললেন 'এই ডালিম'। তখনো জানি না কী করবে না করবে, মেরে ফেলার জন্য এনেছে না কী করবে ? একটু পরে রশীদ [মেজর আব্দুর রশীদ] আসল। সে ইলেকট্রিক কানেকশন আছে কিনা লোক লাগিয়ে পরীক্ষা করল। এরপর সৈয়দ হোসেন সাহেব আসলেন। উনি আগেই এরেস্টেড ছিলেন।

শারমিন আহমদ : সৈয়দ হোসেন কে ?

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন– বঙ্গবন্ধুর...

আব্দুস সামাদ আজাদ : বঙ্গবন্ধুর ভগ্নীপতি। তো ওনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রশীদ বলছিল "আপনাকে আমরা এনেছি আপনিতো কারাগারেই আছেন" [টেপের এই অংশটি অস্পষ্ট] পরে আমরা জানতে পারলাম... রশীদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল আমাদের মেরে ফেলবে। এমন ভাবসাব। কারণ ইলেকট্রিক ওয়্যারিং টয়্যারিং করছে। একটু পর দেখি ফটোগ্রাফার আসল। একজন ফটোগ্রাফার আমার সাথে অ্যাটাচড ছিল [বঙ্গবন্ধু প্রশাসনে মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে] সে বলল 'স্যার আমাদেরকে ঘুম থেকে উঠিয়ে এনেছে'। তারপর দেখি টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যানও আছে। তারপর রশীদও চলে গেল। আমরা ভাবছি কিসের জন্য আনল না আনল–এর মধ্যেই আরেকজন এসে বলল 'আপনারা চলেন'। বললাম 'কোথায় ?' সে বলল, 'ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ?'

শারমিন আহমদ : কে এসে বলল ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : কোন এক অফিসার। মিলিটারি অফিসার। বলল 'সেন্ট্রাল জেলে চলেন।' তারপর আমাদেরকে কারে নিল। এই পাঁচ জনকে কারে নিল।

শারমিন আহমদ : আব্বুর সাথে কি আপনি ছিলেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : হ্যাঁ, আমি, তাজউদ্দীন সাহেব, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান সাহেব।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আহহা ! [দুঃখ প্রকাশ]

আব্দুস সামাদ আজাদ : আমরাতো সেন্ট্রাল জেলে ঢুকলাম ঐদিনই এগারোটা সাড়ে এগারোটায়। দিনের বেলা।

শারমিন আহমদ : বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটা ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : মনে হয় ঐ রকমই সময়।

শারমিন আহমদ : আব্বুকে ধরে নিয়েছিল ২২ আগস্ট বেলা-

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : ৮ টায়।

আব্দুস সামাদ আজাদ : মনে হয় তখন রোদ উঠে গিয়েছিল। সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে ঢুকলাম। কী সিচুয়েশন ! সমস্ত জেলখানায় কয়েদিদের তালা বন্ধ করে রেখেছে। আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম এ অবস্থায়– কী হবে না হবে। আমি, তাজউদ্দীন সাহেব তো আগে থেকে জেল খাটা লোক। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কয়েদিরা হইচই করছে জানালা দিয়ে। জাসদ আছে, নকশাল আছে, তারা নাম ধরে ধরে ডাকছে। এরপরে আমাদের এপ্রুভার সেলে রাখল।

শারমিন আহমদ : কী সেল ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : এপ্রুভার। ঐ যে রাজসাক্ষী হয়। খুব খারাপ সেল। ২০ নম্বর ওয়ার্ড। আমি প্রটেস্ট করলাম। এখানে থাকব না। আমরা তো জেল খেটেছি। সব ওয়ার্ড জানা আছে। জেলার বলল "স্যার জায়গা তো নাই। আপনাদের তো আলাদা রাখতে হচ্ছে।" জেনারেলি এইসব হই চইয়ের মধ্যে সৈয়দ সাহেব বের হতে চাননি। আমরা তো জেল খেটেছি।

শারমিন আহমদ : সৈয়দ নজরুল কি এর আগে জেল খাটেননি ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : সৈয়দ সাহেব তো জেল খাটেননি। এই অবস্থায় আমাদেরকে নিল পরে।

[অন্য জায়গায়] আইজির অফিস ছিল একটা এরিয়ায়। সেটা তখন অফিস নাই। সেই বিল্ডিংটাকে [অফিস] খালি করে করে আমাদেরকে নিয়ে গেল বিকাল বেলায়। সেটার নাম নিউ জেল। সেই জেলে রাস্তাও ছিল না, বাগানও ছিল না। তাজউদ্দীন সাহেব নিজেই বাগান করেছেন।

শারমিন আহমদ : যে সময় [ওখানে] ছিলেন তখুনি আব্বু বাগান করেছিলেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : হ্যাঁ। দুই মাস পর্যন্ত– বড় বাগান। কয়েদিদের নিয়ে নিজেই মাটি খুঁড়তেন। সুন্দর বাগান করেছিলেন। এরিয়াটাকে খুব সুন্দর করা আরকি। নিট অ্যান্ড ক্লিন করা। ওটা বাজে জায়গা ছিল। ড্রেন গুলি পচা

ছিল। সেগুলোকে সুন্দর করেন। এইভাবে জেল খানার জীবন চলছে। নানা রকমের রিউমার ডেইলি যায়। প্রথম দিকে ইন্টারভিউ দিচ্ছিল না পরে ইন্টারভিউ দেওয়া শুরু হলো। আমাদের সকলেরই।

শারমিন আহমদ : কে ইন্টারভিউ দেওয়া শুরু করল ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : আমাদের ফ্যামিলির সাথে ইন্টারভিউ। আমাদের সাথে ফ্যামিলি মেম্বাররা দেখা করা আরম্ভ করল।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আমাদেরকে প্রথম দিকে দেখা করতে দেয়নি। [অন্যদের সাক্ষাতের অনুমতি আগে মিললেও একমাস পরে তাজউদ্দীন আহমদের পরিবারকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়]

আব্দুস সামাদ আজাদ : হ্যাঁ প্রথম দিকে দেয়নি। পরে ইন্টারভিউ দেয়। তারপরে ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে যতটুকু সময় কাটাই, ফ্যামিলির সমস্যা ছাড়াও, বাইরের খবর টবর কী অবস্থা এই সব জানি। ওরা তখনো আছে বঙ্গভবনে– মোশতাক, রশীদ, ফারুক [তদানীন্তন মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান] এরা আছে এই খবর টবর পাই। তার কিছুদিন পরে, প্রায় দুই মাস [তখন] হয়ে গিয়েছে– কোন পরিবর্তন কি হবে ? আমরা কি ছাড়া পাব ? [এই চিন্তা ভাবনা শুরু হয়]

[অস্পষ্ট] ... -ইনভেসটিগেশন শুরু করেছে স্পেশালি আমাদের এই কজনের। এখানে [ইনভেস্টিগেশনে] মিলিটারি অফিসারসহ চার-পাঁচজন বসেছে। তারা আমাদেরকে প্রশ্ন করে।

শারমিন আহমদ : তারা কী ধরনের প্রশ্ন করে ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : এই সমস্ত পার্সোনাল [বিষয়]– কার কোথায় কী আছে, না আছে। আমাদের বাড়ি-ঘর– প্রপার্টি ইত্যাদি সমন্ধে স্টেটমেন্ট দিতে হয়। ইনভেস্টিগেশন আরকি। পুলিশের লোক দুইজন আছে। বাকি মিলিটারি। জেল গেটেই।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : রাজনৈতিক অবস্থার ওপর তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে কী বলতেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : এটা পরে আলাপ করব। পলিটিকাল আলাপটি পরে করব। তোমার সঙ্গে [শারমিন আহমদকে লক্ষ্য করে] আলাপ করব আরেক সিটিংএ।

শারমিন আহমদ : আমি পুরো ঘটনাটি টেপ করে রাখতে চাচ্ছি। সে সময় কী পরিস্থিতি ছিল ? হয়তো একদিন আমি বেঁচে থাকি কি আপনি বেঁচে থাকেন– কিন্তু ইতিহাস বেঁচে থাকবে।

আব্দুস সামাদ আজাদ : তারপরে আমাদেরকে প্রথমে ডিভিশন দেয়নি। প্রথম রাতে আমরা সাধারণ ঘরে...

শারমিন আহমদ : প্রথম কতদিন ডিভিশন দেয়নি ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : প্রথম দিন ও রাতটা ডিভিশন দেয়নি। পরদিন বোধহয় একদিন পরেই আমাদেরকে ডিভিশন দিয়ে দিল। ক্লাস ওয়ান। প্রথম রুমটা ছিল ছোট। সবাই এই রুমে প্রথমে উঠেছিল। এরপরেই ঐ বিল্ডিঙে আরেকটা রুম। তারপরে বড় রুমটা। ঐ রুমটায় আমি চলে গেলাম। আমার সাথে মনসুর আলী সাহেব ছিলেন। [নিউ জেল বিল্ডিং]

শারমিন আহমদ : আপনি কত নং রুমে ছিলেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : তিন নাম্বার রুমে।

শারমিন আহমদ : তিন নাম্বার রাজবন্দিদের ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : এই বিল্ডিংটা আইজির অফিস ছিল। জেলের ভিতরেই। পরে নিউ জেল নাম দেয়। এটা, ফাঁসি দেয় যে এরিয়ায়, সেটা পার হয়ে– আরেকটা ওয়াল আছে, তারপরে এটা। সেটাতেই আমাদের জন্য জেল বানায়।

শারমিন আহমদ : আইজির অফিসের তিন নাম্বার রুমে ছিলেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : না। একটা বিল্ডিং আছে আইজি অফিসের। সেই বিল্ডিঙের তিনটা রুম। প্রথম রুম হলো আমরা নিজেরাই [নাম্বার] বলতাম আরকি। প্রথম রুমটায় গিয়ে বসলাম। সবাই ঐ রুমে গিয়ে বসলাম। সন্ধ্যার দিকে দেখলাম ঐ রুমে তো থাকা যাবে না। মাঝের রুমে গেলেন কামরুজ্জামান ও আরও কিছু লোক। লাস্ট রুমটায় আমি গেলাম।মনসুর আলী বললেন 'আমি সেখানে থাকব'।

শারমিন আহমদ : আব্বু কোন রুমে থাকতেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : এই প্রথম রুমটায়। এই রুমটা ইতিহাস !

[বড় মর্মান্তিক ইতিহাস। এই এক নম্বর রুমটিতে অন্যান্যদের সাথে থাকতেন তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বঙ্গভবন থেকে মোশতাক-রশীদের নির্দেশ প্রাপ্ত হত্যাকারীদের আদেশে দুই নম্বর অর্থাৎ মধ্যের রুম থেকে কামরুজ্জামান সাহেব এবং তিন নাম্বার বা শেষ রুম থেকে মনসুর আলী সাহেবকে প্রথম রুমে নিয়ে যায় জেল কর্তৃপক্ষ। বাকি নেতৃবৃন্দকে ঐ রুম থেকে সরিয়ে রাতের গভীরে মুক্তিযুদ্ধের চার নেতাকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়।]

শারমিন আহমদ : আব্বুর সাথে কেউ ছিলেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : হ্যাঁ কিছু গেলেন এখানে [প্রথম রুমে] আর সবাই রইলেন তিন নম্বর রুমে । বিল্ডিংটা এভাবে লম্বা। এই রুমটা পয়লা পাওয়া যায়। এরপর দুই নম্বর সেখানে কামরুজ্জামান ও সাথে আরও কিছু লোক– সঙ্গে যারা ছিল– মায়া [শ্রমিক লীগের নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী] ও আরও কয়জন। আর লাস্ট রুমে– এটা বড় রুম-তিন নম্বর– আমরা বলি আরকি। জেলের নম্বর কী আছে আমরা জানি না। তারপর সেই রুমে প্রথমে আমি আর মনসুর আলী পরে আরও বহু লোক (গেলেন)।

শারমিন আহমদ : আর সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব কোথায় থাকতেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : ঐ এক নম্বর রুমে। সৈয়দ সাহেব, তাজউদ্দীন সাহেব, শেখ আব্দুল আজীজ, মাখন (ছাত্র নেতা আব্দুল কুদ্দুস মাখন), কোরবান আলী, শেষ পর্যন্ত যারা ছিল আরকি। মোট ৮ জন ছিল। [১নং কামরায় থাকতেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, শেখ আব্দুল আজীজ, দেলওয়ার হোসেন, আনওয়ার জং, ডাঃ আসহাবুল হক, কোরবান আলী ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন]

শারমিন আহমদ : দ্বিতীয় রুমে কামরুজ্জামান ...

আব্দুস সামাদ আজাদ : কামরুজ্জামান ও আদার্স, প্রায় ১২ জন। তৃতীয়টায় যারা আসত (জেলে) তারা ওখানে যেত। কারণ বড় রুম তো। যেমন জোহা সাহেব...

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : জোহা সাহেব তো অনেক পরে গেলেন।

আব্দুস সামাদ আজাদ : হ্যাঁ পরে গেলেন। তিন নম্বর রুমে জায়গা বেশি ছিল। তারপর ১ তারিখে আমাদের ইন্টারভিউ হচ্ছে– বিভিন্ন খবরাখবর পাই

শারমিন আহমদ : ১ তারিখ কোন মাসের ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : নভেম্বর মাসের। পয়লা নভেম্বর। জেলার...

শারমিন আহমদ : জেলারের নাম কী ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : মনে হয় মোখলেসুর রহমান। গোপালগঞ্জ বাড়ি। (সঠিক নাম আমিনুর রহমান যা পরে জানতে পারি) এখনো আছে।

শারমিন আহমদ : এখন উনি কোথায় আছেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : ... (অস্পষ্ট) সুপারিটেনডেন্ট ছিল। এখন কোথায় আছে জানি না।

শারমিন আহমদ : আর ডিআইজি প্রিজনের নাম জানেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : আউয়াল সাহেব (আব্দুল আউয়াল), আর আইজি (প্রিজন্স) ছিলেন নুরুজ্জামান।

শারমিন আহমদ : তারপর কী হলো ? পয়লা নভেম্বর ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : পয়লা নভেম্বর তাজউদ্দীন সাহেবের ইন্টারভিউ ছিল (বেগম জোহরা তাজউদ্দীনের সাথে)। উনি ডায়েরি লিখতেন। তো বিকাল বেলায় আমি ও ইনি একটু বেড়াতাম। সকালেও বেড়াতাম, বিকালেও ঐ এরিয়ার ভেতরে। বেড়াবার সময় যা কথাবার্তা হতো। মাঝে মাঝে মিলাদ পড়তাম, খতম পড়তাম। এই সব সময় বসতাম। পার্সোনাল আলাপ-টালাপ হতো বেড়াবার সময়। তো ঐ দিন বিকাল বেলা [১ নভেম্বর] তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে প্রথম বললেন যে "জেলটা আমার যেন মনে হচ্ছে যে রেডক্রসে নিলে ভালো হয়। রেডক্রসের হাতে না নিলে জেলটা মনে হচ্ছে ডেঞ্জারাস... "

শারমিন আহমদ : মাই গড ! আব্বু এটা বললেন যে জেলটা...

আব্দুস সামাদ আজাদ : এটা পুরা একটা ইম্প্রেশন। ওনার ইম্প্রেশনটা বললেন। তারপর আমাকে বললেন "আপনি দেখেন একটা কিছু করা যায় কিনা। আমিও চেষ্টায় আছি। আপনিও চেষ্টা করেন।"

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : ইশশ ! কী আতঙ্ক ঢুকে গিয়েছিল ! বুঝে গিয়েছিলেন...

শারমিন আহমদ : ওহ ! তখুনি আব্বু বুঝতে পেরেছিলেন...

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : উনি বুঝে গিয়েছিলেন যে জেলে সিকিউরিটি নেই...

আব্দুস সামাদ আজাদ : তখন তো উলটা আমাদেরকে খবর দেওয়া হয়েছে যে চার পাঁচ দিনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। তাজউদ্দীন সাহেব তো সেদিন কথায় কথায় ওনার ইম্প্রেশন বললেন যে "আপনিও চেষ্টা করেন আমিও চেষ্টা করি যে কোনো ভাবে রেডক্রসে খবর পৌছান যায় কিনা।" তারপর সন্ধ্যার পর মনসুর আলী সাহেব আমার পাশের সিটে ছিলেন [৩ নম্বর রুমে পাশাপাশি বিছানায়) উনিও একটু আনমনা। আমাকে বললেন "সামাদ সাহেব, কী যে এরা খবর টবর বলে। এমনি কথায় কথায় শোনা যায় যে মনে হয় ছেড়ে দেবে– কোনো কেইস তো [দোষী সাবাস্ত করে কেইস] দাঁড় করাতে পারছে না"। কিছুটা প্রাইভেটলি ঐ জেলের ভেতর থেকে খবর যায়।

শারমিন আহমদ : মনসুর আলী সাহেবের সাথে কথা হয় সেদিন সন্ধ্যায় ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : হ্যাঁ। সে তো আমরা এক রুমে থাকি। মনসুর আলী সাহেব ও আমি পাশাপাশি। মনসুর আলী সাহেব বললেন "সামাদ সাহেব আমাদের জেলখানাটা... মিলিটারির লোকরা আসে যায়"। একদিন রাতে আমাদের সবাইকে [জেল কর্তৃপক্ষ] এসে জানিয়ে গেল যে কিছু

মিলিটারির লোকরা যাবে তো– এখানে গান বাজনা– বাচ্চারা তো গান-টান গায়– ছেলেরা [তরুণ রাজবন্দিরা সময় কাটানোর জন্য কখনো একত্রে গান গাইতেন] একটু হইচই কম হলে ভালো হয়–এইসব বলছিল। দুইদিন আগে দেখেছিলাম যে রাতে কিছু মিলিটারির লোক ঐসব [নিউ জেল] এরিয়া দেখেছিল।

শারমিন আহমদ : ঐসব এরিয়া টহল দেয় ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : না, না– দেখতে গিয়েছিল। তখন তো কোন গভর্নমেন্ট নাই। জেল কর্তৃপক্ষ জানে না তারা কী করছে। তারা এসে জানাল "আজ রাতে মিলিটারির লোক এসে এরিয়াটা প্রদর্শন করবে।" আমরা তো তখন মিলিটারির রাজত্বে। খুব কড়া রাজত্ব। মোশতাকের গভর্নমেন্ট [নামে মাত্র সিভিলিয়ান গভর্নমেন্ট] ... তারপর আনফরচুনেটলি মোশতাক ছিল আওয়ামী লীগের। মোশতাকের ক্যাবিনেটও আওয়ামী লীগেরই। তার মানে আগে যারা মেম্বার [ছিল] তারাই মেম্বার ছিল ক্যাবিনেটে। তারপর মনসুর আলী সাহেব আমাকে বললেন রেডক্রসে খবর দিতে। আমি বললাম "হ্যাঁ তাজউদ্দীন সাহেবও আমাকে বলেছেন। দেখি আমি পারি কিনা।"

সিরিজ ২

ময়েজউদ্দীন আহমেদ। [এম.পি] সাহেব ছিলেন রেডক্রসের সাথে কানেকটেড। আমি রাতেই-আমার যে চ্যানেল ছিল-[গার্ডের মাধ্যমে খবর] পাঠাবার মতো যে চ্যানেল করেছিলাম– সে আসবে কিনা [কিন্তু] ও এসেছে। আসার পর, রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে আমার ঘুম ভাঙল। রাত দুইটা কি আড়াইটায় ঘুম ভাঙল। [রাত] একটায় ঘুমালেও দুইটা কি আড়াইটায় ঘুম ভাঙত। আমার জানালার সামনে–আমাদের জেলখানার জানালার কাছাকাছি তারা আসত।

শারমিন আহমদ : কারা ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : ঐ ডিউটি যারা করত। আমাদের জেলখানার সামনে একটা বারান্দা ছিল-

শারমিন আহমদ : সে জন্য তারা [ঘরের দরজার সামনে] আসতে পারত না ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : সে জন্য একটা ডাবল লক আপ হয়ে যেত। আমাদের রুমটা লক আপ হতো। বারান্দাটাও লক আপ হতো। [বারান্দার গেইট] সুতরাং বারান্দার ঐ দিক থেকে কথা বলত। কোনো জিনিস পাস করতে অসুবিধা হয়। কোনো একটা চিঠি দিতে হলে ঢিল দিত। কিন্তু বারান্দা থেকে যদি সেটা পড়ে যায়– আমি তো সেটা রিসিভ করতে পারছি না।

শারমিন আহমদ : কারা দিত আপনাকে চিঠিপত্র ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : [অস্পষ্ট] সরকারের লোক– জেলখানার নিয়মেই আমরা [চ্যানেল] করে ফেলি। যারা জেলটেল খাটি আমরা খবরটবর দেবার [অস্পষ্ট] [চ্যানেল তৈরি করেন]

শারমিন আহমদ : কিন্তু আপানারা [খবর] দিতে পারতেন না বারান্দাটার জন্য ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : রাতে এই অসুবিধা হতো।

শারমিন আহমদ : জেলখানার বারান্দার মধ্য লক আপ ছিল ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : হ্যাঁ লক আপ ছিল। ডাবল ব্যারিয়ার। দূর থেকে দিতে হতো ঢিল দিয়ে। যদি আমি রিসিভ করতে না পারি তাহলে সকালে [অন্য গার্ডরা] এসেই যদি পেয়ে যায় তাহলে ধরা খেয়ে যাব। সে জন্য সাবধান থাকতে হতো। তো বারান্দার ওখানে নামাজ পড়ছি, তখন সে লোকটা [নাইট গার্ড] আসল। যে লোকটা আমার চিঠি নেয়। তো সে আসছে। আমি বললাম যে আমার একটা চিঠি [আছে]। সেই লোকটা মসজিদে নামাজে যেত। ইমাম সাহেবের কাছে [চিঠি] দিয়ে আসত। ইমাম সাহেব আমার বাসায় পৌঁছে দিত। এটা [চ্যানেল] এসটাব্লিশ করতে সময় লাগে। আমি গিয়েই করেছি। সেজন্যই তাজউদ্দীন সাহেব জানতেন যে আমি পারব। তো আমি একটা চিঠি [জানালা পথে] ময়েজউদ্দীনের কাছে পাঠালাম। আমি লিখে পাঠালাম যে "জেলের পরিস্থিতিটা ভালো লাগছে না। অতি সত্বর চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি জেলখানাটাকে রেডক্রসের আওতায় আনা যায় কিনা সেটার একটা চেষ্টা করো।" তখন তো কোনো আইন নাই, কানুন নাই। whole আর্মি এটার মধ্যে নাই। তারা ক্যান্টনমেন্টে। আর এই লোকগুলো বঙ্গভবন দখল করে বসে আছে– ট্যাংক কয়েকটা নিয়ে। আর ক্যান্টনমেন্টে যারা আছে তারা তো আরেক কমান্ডে। তাদের কমান্ডতো এদের উপর নাই। এদের কমান্ড আবার ওদের উপর নাই। [দল ছুট জুনিয়র আর্মি ও মোশতাক চক্র বঙ্গভবনে।] এই ছিল একটা অবস্থা। এই অবস্থায় তারা যে কোনো জিনিস পাগলামি করে করে ফেলতে পারে। মেরে ফেলতে পারে। এই যে একটা চিন্তা-পরিস্থিতি যে নেক্সট কোনো গভর্নমেন্ট হবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে [স্বীকৃত] যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের পিলার– তাদেরকে এই কারণে এলিমিনেট করে দিতে পারে। এই যে একটা মনোভাব– এটা খুব ইনফরমেশন ভিত্তিক না– এটা একটা গেস ওয়ার্ক। তো আমি ১ তারিখ রাতে ওকে পেলাম। আমার চ্যানেল এসে গিয়েছে ডিউটিতে, তাকে [চিঠি] দিয়ে দিলাম। সে বলল "স্যার কাল আমি নামাজে যাব।" তাকে তো বলতে হয় না। এর আগেও নিয়ে গিয়েছে। উত্তরও এসেছে।

শারমিন আহমদ : সেটা কি ২ তারিখ রাতে না ১ তারিখ রাতে ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : ১ তারিখ রাতে। তারপর ২ তারিখ গেল। দুই তারিখ নভেম্বরের। একজ্যাক্ট অবস্থাটা তোমাকে বলি। আমাদের যে বিল্ডিংটা, এরপরে কিচেন তারপরে আরেকটা এরিয়া আছে যেখানে বেশির ভাগ আমাদের লোক [রাজবন্দি] থাকত। সেই জায়গায় আরেকটা দিক আছে– [অস্পষ্ট] তার ডান দিকে ডেপুটি সুপারেনটেনডেন্ট বাড়ি ছিল। এই আমাদের এলাকায়। তো বাড়িটা এরিয়ার সাথে সাথে তো। তো জানালাগুলো বন্ধ রাখত। যাতে ওখান থেকে কেউ কথা না বলতে পারে। পাকা রাস্তা আছে। পাকা রাস্তা আমরা করেছিলাম [অস্পষ্ট] হাতে। ওখানে ছায়া আছে। ওখানে টেবিল চেয়ার নিয়ে বিকাল বেলা তাজউদ্দীন সাহেব খুব নিরিবিলিতে কী লিখছেন। ঐ ডায়েরি লিখছেন। খুব একবারে [নিবিষ্ট মনে] একটা কথার জবাব একবারে দিচ্ছেন। পাল্টা যে আরও কিছু কথা কওয়া– বলছেন না।

শারমিন আহমদ : কোথায় লিখছেন ? ঐ ছায়াতে বসে ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : ছায়া আছে গাছের। ছায়া পড়ে না বিকেলে– ওখানে একটা টেবিল– চেয়ার পেতে-ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল তো...

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : উনি সব লিখে গিয়েছিলেন।

আব্দুস সামাদ আজাদ : ডায়েরিটা পরে পেলাম না।

শারমিন আহমদ : অনেকে বলে এটা কোরবান আলীর কাছে...[পরবর্তী সাক্ষাৎকারদাতা মহসীন বুলবুল কনফার্ম করেন যে তাজউদ্দীন আহমদের ঐতিহাসিক ডায়েরিটি কোরবান আলী নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন।]

আব্দুস সামাদ আজাদ : ঐ ডায়েরিটা ঐ রুমে যারা ছিল কোরবান আলী এদেরকে আমরা বললাম যে ডায়েরিটা দাও। ডঃ আসহাবুল হক উনিও ছিলেন।

শারমিন আহমদ : কে– না প্রথম বললেন যে কোরবান আলী নিয়ে গিয়েছেন।

আব্দুস সামাদ আজাদ : আসহাবুল হক, মাখন [পরের বাক্য অস্পষ্ট] ... তারপর আমি বললাম যে তাজউদ্দীন সাহেব উঠতে হবে। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। লক আপ হয়ে যাবে। মাগরিবের আজান পড়লেই লক আপ হয়ে যায়। বারান্দার দরজা ও তিনরুমের সামনের লোহার শিক ওয়ালা চারটি দরজা তালা চাবি দিয়ে লক আপ করা হতো।

শারমিন আহমদ : গেট লক আপ হয়ে যায় ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : আমাদের ঘরের বাইরের দিকে লক আপ করে রাখে। জেলের ভেতর আমরা যে থাকি– ভেতর দিকে লক আপ হয় না।

বাইরের দিকে তালা মেরে আমাদের ভেতরে রেখে দেবে। আবার সকালে খুলবে। না খুললে আমরা বাহির হতে পারব না। তো সাধারণ কয়েদিদের এক নিয়ম। আমাদের আরেক নিয়ম। আমাদেরকে ভোরবেলায় খুলে দিত কারণ আমাদের বেড়াতে হবে, নামাজ পড়তে হবে। পলিটিক্যালি আদায় করে নিতে হয় আরকি। তো আমাদের একটা কমিটি হয়েছিল। জেলখানায় আমাদের থাকা টাকা, কী করে উন্নতি হবে সংক্রান্ত বিষয়ে একটা কমিটি। আর আমরা পাঁচ জন মিলে আরেকটা কমিটি। আমি, নজরুল সাহেব, তাজউদ্দীন সাহেব, মনসুর আলী সাহেব, কামরুজ্জামান সাহেব আমরা পাঁচজন মিলে একটা একজিকিউটিভ কমিটি ফর্ম করি, যাতে আরও closely আলাপ করতে পারি। সকলে আমার রুমে যেয়ে বসতেন। তো তাজউদ্দীন সাহেব তো খুব আইন মানা লোক ছিলেন। তো যারা বাইরে গিয়ে আলাপ করতেন, বলতেন একজন আলাপ করবে, সামাদ সাহেব আলাপ করবে। চৌদ্দ জনের আরেকটা কমিটি হয় আসাদুজ্জামান, রশীদ সরদার, এস.পি মাহবুব [সহ]।

শারমিন আহমদ : কোন আসাদুজ্জামান ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : সেক্রেটারি ছিলেন গভর্নমেন্ট। এখনও আছেন চাকরিতে। জেল থেকে বের হয়ে চাকরিতে গিয়েছেন আরকি। এনারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ছিলেন– এনাদেরকেও আমাদের লোক মনে করে জেলে দিয়েছে আরকি। যাই হোক আমরা বসতাম, আলোচনা করতাম। ঐদিন [২ নভেম্বর বিকালে] আমি ডাকলাম, বললাম "শুনেন লক আপ তো হয়ে যাবে- আমরা একটু বেড়াই।" আমরা তারপর হাঁটলাম। বললাম "ইন্টারভিউতে ভাবি এসেছিলেন কিনা"– তোমার আম্মার কথা। বললেন "আমার ইন্টারভিউটা আসতে দেরি হবে কারণ ক' দিন আগে ইন্টারভিউ হয়েছে"।

শারমিন আহমদ : দোসরা নভেম্বর আপনার সাথে আব্বুর ইন্টারভিউ ছিল তাই না আম্মা ?

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : ফার্স্ট নভেম্বর।

আব্দুস সামাদ আজাদ : সেদিন হয়েছিল– এই আমার মনে পড়েছে। [তাজউদ্দীন আহমদ ১ নভেম্বর ওনার স্ত্রীর সাথে ইন্টারভিউয়ের কথা বলেছিলেন যা বেগম তাজউদ্দীনের কথায় আব্দুস সামাদ আজাদের মনে পড়ে] ঐ ইন্টারভিউ নিয়ে আলাপ করছিলাম– ২ তারিখ হলো। ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ হচ্ছে আরকি। উনি একটা চিঠি দিয়েছিলেন ভাবির মাধ্যমে মানিক চৌধুরীর [এম. পি] কাছে। বললাম যে কাজ টাজ বাইরে করার প্রশ্ন উঠছে। পার্লামেন্টে মেম্বারদের ডাকবে। ওরা প্রেশার দিচ্ছে ডাকবার জন্য।

শারমিন আহমদ : কারা ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : বাইরে পার্লামেন্টে । মানিক চৌধুরী ছিল, ময়েজউদ্দীন ছিল [মোশতাকের বিপক্ষে]। আর কিছু লোক ছিল– ইউসুফ আলী, সোহরাব হোসেন [পক্ষে] ওরা উল্টা মেম্বারদের বোঝাচ্ছে– যা হবার হয়ে গিয়েছে...এভাবে বাইরের খবরগুলো পেতাম। পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে, মোশতাক যে ডাকবে শিওর হতে পারছেন না। পার্লামেন্ট নিয়মিত হবে কিনা– সদস্যরা যারা আছে এই নিয়ে একটা লবি হচ্ছে। সেই লবির খবরটা আমরা পেয়েছি। মানিক চৌধুরী আমাদের পক্ষে [মোশতাকের পার্লামেন্টকে বর্জনের পক্ষে আওয়ামী লীগের এক অংশের তৎপরতা] আর ইউসুফ আলী, সোহরাব হোসেন ওনারা তো মন্ত্রীই আছেন [প্রথমে বঙ্গবন্ধুর সরকারে তারপর মোশতাকের সরকারে]।ওনারা মেম্বারদেরকে অন্যভাবে বোঝাচ্ছে যাতে মোশতাককে মেনে নিয়ে একটা পার্টি বিলড আপ করা যায়। সেই লাইনে [কথাবার্তা চলছে] এইসব খবর আমরা পেয়েছি। এসব আলাপ -টালাপ করে রাতে লকআপে চলে গিয়েছি। যার যার রুমে চলে গিয়েছি। গার্ড আসছে চাবী নিয়ে। একটা রুমে তালা মারে তারপর আরেকটা রুমে। লাস্টে আমাদের রুমে তালা মারে। আমাদের রুমে প্রায় পঁচিশ জন ছিল। আমাদের রুম বড় তো। জোহা সাহেব [সামসুজ্জোহা এম.পি], আতিউর রহমান, তারপর আমু [আমির হোসেন আমু] ছিল, সৈয়দ হোসেন... ঐ সময়টায় প্রায় পঁচিশ-তিরিশ জন ছিল। রাতে এক সঙ্গে নামাজ পড়তাম। এক সঙ্গে খেতাম। যার সাথে যার খাতির আছে তার সিটে যেয়ে গল্পসল্প করতাম। রাতে ঐযে আমার অভ্যাস ছিল ঠিক সবাই ঘুমিয়ে গেলে লাইট অফ করে দিতাম। টেবিলে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে যাতে কারো অসুবিধা না হয়, আমি ইয়াসিন সুরা পড়তাম। ইয়াসিন সুরা পড়ে আমি ঘুমাতাম। আমার পাশে মনসুর আলী সাহেব ছিলেন। তার পরের সিটটায় ছিলেন সৈয়দ হোসেন সাহেব। তারপর অন্যান্যরা। আমি কোরআন শরিফ পড়ছি। উনি আমার পাশের সিটটা থেকে উঠে, উনি কাছে এসে উপুড় হয়ে আস্তে আস্তে বললেন "সামাদ সাহেব পাঠিয়েছেন ?" [সামাদ সাহেব মনসুর আলীর উদ্বিগ্ন গলার অনুকরণে বললেন]

শারমিন আহমদ : কোনটা ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : জিজ্ঞেস করলেন রেডক্রসে [খবর]পাঠাতে পেরেছিলেন ? আমি ওনাকে সাহস দিলাম। উনি বললেন "আমার জানি কেমন মনে হচ্ছে"। এই স্বাভাবিক আলাপ কিন্তু উনি একটু ওয়ারিড। আমি বললাম "আল্লাহ,আল্লাহ করেন। আমাদের তো আর করার কিছু নাই"। এরপরে আমি ঘুমিয়েছি। তারপর ঐযে বললাম তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে ঠিক রাত আড়াইটার সময় আমার ঘুম ভাঙে। ঘুম থেকে উঠে আমি তাহাজ্জুদ পড়ছি। লাইট-টাইট

না জ্বালিয়ে। শুধু বাইরের লাইটে। রাতের ডিউটি হলো রাত ১১ টা ,তারপর ১ টা। দুই ঘণ্টা পর পর চেঞ্জ হয়।একদল যায় আরেক দল আসে। তারপর আবার ৩ টায় চেঞ্জ হয়।এ সময় আমি আড়াইটার নামাজ পড়ে বসে আছি।

শারমিন আহমদ : আবার ৩ টায় চেঞ্জ হয়।

আব্দুস সামাদ আজাদ : রাতের ডিউটি হলো ২ ঘণ্টা পরপর। দিনের ডিউটি হলো ৬ ঘণ্টা পরপর।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আপনি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে বসলেন–

আব্দুস সামাদ আজাদ : ঐ ডিউটিতে আসবে সিপাই, যার যার ওয়ার্ডে ডিউটি আছে না-এই ডিউটি সেই ডিউটি। ৩ টার সময় একটা চেঞ্জ হয়। অন্য লোক না আসা পর্যন্ত এরা যাবে না। তারপর নতুনরা আসবার পর যারা যাবার তারা গিয়েছে এবং যারা আসবার তারা এসেছে।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : পাগলা ঘণ্টি বাজল না ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : আরও পরে। আমরা তো তখনও জানি না কী হবে। আমি নরমালি জিজ্ঞেস করছি [ডিউটিরত গার্ডকে] কী কেমন আছেন– ঐ যে লোকটা আমার চিঠিপত্র [আদান প্রদান করত]

শারমিন আহমদ : সে তখন ডিউটিতে এসেছে ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : হ্যাঁ। ঐ সপ্তাহ হয়তো ডিউটি করবে। সে আমাকে বলল "কেমন আছেন ?" আমি বললাম "ইমাম সাহেব কেমন আছেন ?" সে ইমামতি করত। সে বলল "ভালো আছি।" এর মধ্যেই শুনি হুইসেল বাজছে। বললাম "কী হলো হুইসেল বাজে কেন ?" তখন সে বলল "আমরা যখন আসি তখন আইজি এসেছিল।" জেনারেলি আইজির অত রাতে আসার কথা না !

শারমিন আহমদ : ডিআইজি প্রিজন্স না আইজি ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : আইজি [প্রিজন্স] ওরা বলল যে "স্যার জেলখানার অন্যান্য অফিসারদেরও দেখলাম।" তারা তো ডিউটিতে আসে যায় তারা তো অত বোঝে নাই। ভাবলাম কয়েদি-টয়েদি পালালে যেরকম ঘটনা হয় তেমন হবে আরকি।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আপনারা ওটাই আন্দাজ করছিলেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : আমরা তো আর বুঝলাম না। তারপর সমস্ত জেল খানায় হুইসেল-পাগলা ঘণ্টা বাজছে। এই হলো কয়েক মিনিটের প্রস্তুতি। এর মধ্যেই দেখি বারান্দার যে জায়গাটা সেকেন্ড গেট মানে ফার্স্ট লক আপ বলে যাকে দেখি ১ নম্বর রুমের কোরবান আলী, শেখ আব্দুল আজীজ, মাখন, ড. আসহাবুল হক... [৩ নম্বর রুমে ঢুকছেন]

শারমিন আহমদ : বারান্দার ফার্স্ট লক আপটা খুলে ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : রুমে ঢুকতে তো একটা বারান্দা থাকে। তারা তো ওয়ারিড অবস্থা। বললেন কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আমাদেরকে তো এখানে নিয়ে এসেছে।

শারমিন আহমদ : ফার্স্ট লক আপ খুলে তাঁদেরকে আপনার ঘরে নিয়ে আসে ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : আমাদের যে রুমটা সেটা তো একটা বিল্ডিঙের মতো। ওদিকে কী হচ্ছে আমরা তো আর কিছু জানি না। আমরা তো রুমের ভিতরে। বারান্দা আছে-রেলিং আছে।

সিরিজ ৩

শারমিন আহমদ : রুমগুলো হচ্ছে ১,২,৩। এরকম আঁকা। [নিজে রুমগুলোর একটি ছবি এঁকে আব্দুস সামাদ আজাদকে অনুরোধ করলাম উনিও যেন একটি ছবি আঁকেন যাতে ঐ নির্মম হত্যাকাণ্ডের স্থানটি সমন্ধে আরও ধারণা পাওয়া যায়] আপনি আমাকে একটু এঁকে দেখান তো তাহলে আমি বুঝব।

আব্দুস সামাদ আজাদ : চশমাটা কোথায় ? [তিনি বিস্তারিত ছবি আঁকলেন] এই হলো ৩ টা রুম। এই হলো বারান্দা। জেলখানা থেকে আসে এই দিক দিয়ে। এই যে কিচেন। এই দিকে আরেকটা ওয়ার্ড আছে টিন শেডের। এটা কিন্তু লোহার শিকের খোলা দরজা। সব জেলখানা কিন্তু খোলা।

শারমিন আহমদ : খোলা দরজা আচ্ছা। লোহার শিকের। তার মানে লক আপের মধ্যে দিয়ে কথা বলা যায়। খোলা শিক ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : শিকগুলো তো ওপেন। কাঠ নাই। জেলখানার সবটাই ওপেন– শিকের দরজা। সমস্ত জেলখানার বিল্ডিঙের নিয়ম হলো ঢুকিয়েই লক আপ করে দেবে।

শারমিন আহমদ : এটা লক আপ করে তারপর আবার এটা লক আপ করবে।[সামাদ সাহেবের হাতে আঁকা নিউ জেল বিল্ডিঙের ১,২, ও ৩ নম্বর রুমের ছবি নির্দেশ করে।]

আব্দুস সামাদ আজাদ : আবার এখানে একটা ডাবল ল কআপ [ছবি নির্দেশ করে]। এখানে বারান্দাও যেহেতু লক আপ ওখান দিয়ে ভেতরে কেউ ঢুকতে পারে না। সুতরাং এই সময় এই রুমের [১ নম্বর রুমের ছবি। এই রুম হতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দীন আহমদ ছাড়া বাকি সবাইকে হত্যাকারীদের নির্দেশে জেল কর্তৃপক্ষ ৩ নং রুমে পাঠায়] এই কটি লোক

বারান্দায়। আমরা বললাম "কী হয়েছে ?" [ওনারা] বললেন "কী জানি আমাদেরকে নিয়ে এসেছে এখানে। অফিসার এসেছে কিসের জন্য।"

শারমিন আহমদ : আপনারা কি ঘরের মধ্যে থেকে জিজ্ঞেস করলেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : না ওনারা এসেছেন আমাদের রুমে।

শারমিন আহমদ : আপনাদের রুমে নিয়ে এসেছে এনাদেরকে।

আব্দুস সামাদ আজাদ : হঠাৎ দেখি আমাদের রুমে। চিন্তা করছি ব্যাপারটা কী। পাগলা ঘন্টি বাজছে। তখন তো জেল অথরিটি কেউ নাই। সিপাই-টিপাইকেও পাচ্ছি না। তখন দেখি মাখন, শেখ আজীজ, ড. আসহাবুল হক, [কোরবান আলী] ঐ চার জন যাদের নাম বললাম– ঐ রুমেরই কয়েকজন যাদের নাম বললাম, রুমে তখনো ঢুকে নাই, তারা বারান্দায়। আমরা জানালা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম "কী হয়েছে ?" তারা বলল "কী জানি আমাদেরকে [এখানে] নিয়ে আসছে কেন, আবার ঐ তিনজনকে– কামরুজ্জামানকে [২ নম্বর রুম হতে বের করেছে] নিয়েছে। সৈয়দ সাহেব আর তাজউদ্দীন সাহেবকে [১ নম্বর রুমে] রেখে দিয়েছে। তাদেরকে বাদ দিয়ে আমাদেরকে এই রুমে নিয়ে এসেছে।" তখন আমাদের লক আপ খুলে এনাদেরকে আমাদের রুমে ঢোকাল। আর কামরুজ্জামানকে ঐ রুমে [১ নম্বর] নিয়েছে কিনা আমরা তো আর জানি না।মনসুর আলীকে আমাদের রুম থেকে তাগাদা দিয়ে [জেল কর্তৃপক্ষ] নিয়ে গেল। সামান্য সময় তো।

শারমিন আহমদ : আর্মি অফিসার কারা ছিল ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : এটা তো আমরা জানি না। জেল অফিসার দুজন ছিল [জেলার আমিনুর রহমান ও সুবেদার নায়েব আলি ওরফে নেয়ামত আলী যা পরে জানতে পারি] আমরা তো যে রুমে আছি সে রুমেই। আমরা মাত্র জিজ্ঞেস করছি কী বিষয়, কী হয়েছে। এই কথা বলতে না বলতেই হঠাৎ শুনি ব্রাশ ফায়ারের শব্দ– সাংঘাতিক ভাবে। আমরা সবাই ফ্লোরে শুয়ে পড়লাম সেকেন্ডের মধ্যে। পাশের রুমে ফায়ারিং [১নম্বর রুমে], ভাবলাম,আমাদের রুমে ফায়ারিং হলো না কেন ? আমরা তখন সব ফ্লোরে, ক্রলিং করে করে চেয়ারের আড়ালে, খাটের আড়ালে আশ্রয় নিলাম। দরজাগুলো তো ওপেন– সমস্ত লোহার বড় বড় শিক দিয়ে– ওপেন জানালা– সকলেই মাটিতে পড়ে ক্রলিং [খোলা জানালা ও দরজার শিক দিয়ে গুলি ঢুকতে পারে এই আশংকায়] তখুনি একটা রিয়েলাইজেশন হলো যে ফায়ারিং এখানে নয় সামহোয়্যার এলস হয়েছে। চারিদিক সাইলেন্ট। একটু পর ফজরের আজান পড়ল। চার পাঁচটা জায়গায় আজান পড়েছে। আজানের আগেই একজন লোক পরে জানলাম একজন সিপাই, সেই একা সুন্দর করে সুরা রহমান জোরে জোরে পড়ছে। সে

ডিউটিতে ছিল। আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। এটা বুঝলাম তাদের [চার নেতার ওপর] ওপর ফায়ারিং হয়েছে। প্রথমে ওদেরকে ঢোকাল। মনসুর আলী ঘুমিয়ে ছিলেন। উনি ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুলেন। ওনাকে তাগাদা দিয়ে [নায়েব আলী] বলল "তাড়াতাড়ি আসেন"। তখনো আমরা জানি না মাঝের রুম থেকে কামরুজ্জামানকে নিয়ে গিয়েছে। সকালে টের পেয়েছি। এর পরে জেলের কোনো সিপাই কিন্তু ডিউটিতে নাই। কাউকে যে জিজ্ঞেস করব...

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : ফায়ারিং এর পর কোনো শব্দ শুনলেন না? ওনাদের কোনো আওয়াজ-শব্দ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : টু শব্দ আসেনি। এখানে তো ওয়াল। চিৎকার করে মায়া ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছে "তোমাদের রুমের খবর কী"? ঐ দিকের [১ নম্বর] রুমের খবর কী? "আর সামনের সেলে [১৫ নম্বর] সব দেখেছে মাহবুব-এস.পি মাহবুব [মাহবুবউদ্দীন আহমেদ]। উনি [১ নম্বর রুমের] উল্টা দিকের সেলে ভেন্টিলেটরের ফাঁক দিয়ে দেখেছেন। উনি পরে বলেছেন আরকি।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : সে দেখেছে সব ! এস.পি মাহবুব !

শারমিন আহমদ : তাহলে তাঁর সাথে দেখা করতে হবে।

আব্দুস সামাদ আজাদ : ২ নম্বর [সঠিক ১নম্বর] রুম সাইলেন্ট। আজান পড়েছে। আমরা তো বুঝে ফেললাম যে একটা ঘটনা ঘটেছে। মনসুর আলী সাহেবকে নিয়ে গেল। কামরুজ্জামানকে "এই কামরুজ্জামান" বলে নিয়ে গেল।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আহ্‌হা !

আব্দুস সামাদ আজাদ : ওরা তো দুই নম্বর রুমে। ওরা তো [পাশের ১ নম্বর] অবস্থা বুঝে ফেলেছে। ওরা বলল "লিডারদেরকে শেষ করে ফেলেছে।"

শারমিন আহমদ : কে বলল এ কথাটা ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : আমাদের মধ্যেই এ কথাটা চলছে। আমরা তো লক আপে।

শারমিন আহমদ : এস. পি মাহবুবকে আপনারা দেখেছেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : আমরা দেখব কী করে ? ঐ রুমটার সামনেই হলো সেলটা। ওখান থেকে সে কিছু দেখেছে। সে পরে বলেছে আরকি। পরে আমাদের রুমে তো সবাইকে আনল– ঐ দিকের সেল থেকে। যারা আমাদের রুমে এসেছিল তারা আর যায়নি। ঐ রুম তো তালা মেরে দেয়।

শারমিন আহমদ : ১ নম্বর রুম ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : পরে জেনেছি। বহু পরে। যখন আমাদের সাথে [জেল কর্তৃপক্ষের] দেখা শোনা হলো। সকালে [৩ নভেম্বর সকালে] তো কেউ আসে না। সমস্ত জেলখানা তালা বন্ধ। সকাল হয়ে গেল। আমি কুরআন তেলাওয়াত করছি। কোনো খবর নাই। একটা সিপাইও নাই।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : রেডক্রসেরও তো কোনো কিছুই হলো না।

আব্দুস সামাদ আজাদ : রেডক্রস বাদই– জেল অথরিটির কোনো লোকও নাই। আমাদের ওখানে একটা সিপাইও নাই, ডিউটি সিপাইও আসে না। আমরা লক আপে তালা মারা।

তার কিছু পরে এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনলাম। আকাশে উড়ছে। ঐযে প্লেনটা উড়ছিল–

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : হ্যাঁ শুনেছি।

শারমিন আহমদ : কিসের প্লেন উড়ল ?

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : জেট প্লেন।

আব্দুস সামাদ আজাদ : আমরা আওয়াজ শুনলাম ভোরবেলায়।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : প্লেনের আওয়াজ ঢাকা শহরে সবাই শুনেছে।

আব্দুস সামাদ আজাদ : আমরা তো ভেতর থেকে কিছু বুঝলাম না। শাঁ শাঁ আওয়াজ শুনছি। আমরা তো তালা মারা কোনো খবর জানি না। কোনো সিপাই নাই। দশটার দিকে কিছু নাশতা নিয়ে– তালাটা খুলে– চুপটি করে বারান্দার গেটটা খুলে– আমাদের রুম খুলল না– নিচ দিয়ে [রুমের দরজার নিচ দিয়ে] কিছু নাশতা দিল। নাস্তা মানে রুটি-টুটি আরকি। কেউ তো খায়-টায় না। খাওয়ার তো কথা না। আমরা তো বুঝেই ফেলেছি ঘটনা কী। তারপরে ৩ তারিখ গেল। আমাদের লক আপ আর খোলা হলো না।

আব্দুস সামাদ আজাদ : ভাবি আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন। ৩ তারিখ সারাদিন গেল– [তিনি এই অংশটি বেগম তাজউদ্দীনকে আগে একবার বলেছিলেন]

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : রাতও পার হলো–

আব্দুস সামাদ আজাদ : আমার মনে হয় ৩ তারিখ রাতও পার হলো। এর মধ্যে দিনের বেলা দুই কর্নেল প্লেইন ড্রেসে–

শারমিন আহমদ : তিন তারিখ রাতে ?

দেশকে মুক্ত করবোই। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে মুক্তিযোদ্ধার অঙ্গীকার।

আব্দুস সামাদ আজাদ : দিনের বেলা।

শারমিন আহমদ : তিন তারিখ দিনের বেলা ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : তিন তারিখ না চার তারিখ মনে হচ্ছে না। তবে তিন তারিখ মনে রেখ।

দুটা কর্নেল– ডি.এফ.আই এর [আর্মির গোয়েন্দা সংস্থা] একজনের কাদের না কী যেন নাম। যেহেতু তারা ইনটারোগেশনে ছিল– মোজাম্মেল আছে আমাদের– ঐ টঙ্গীর– লেবার লিডার ছিল পরে বিএনপি-জাতীয় দলে গিয়েছিল– তো ঐ মোজাম্মেলকে বহুদিন ধরে রেখেছিল ডি.এফ .আইতে আর হাবিবুল্লাহ ও ২ নম্বর রুমের মায়াকেও ওরা [ধরেছিল]...

শারমিন আহমদ : মায়া কে ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : মায়া আমাদের আওয়ামী লীগের ...

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : মুক্তিযোদ্ধা ছিল।

শারমিন আহমদ : মোজাম্মেল, মায়া আর কে ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : মায়া কিন্তু অন্য রুমে। মোজাম্মেল আমাদের রুমে।

শারমিন আহমদ : আচ্ছা মোজাম্মেলকে ধরে নিয়েছিল ডি.এফ .আই--

আব্দুস সামাদ আজাদ : এটা আগের কথা। ঐ ডি.এফ.আই এর লোক তো আমরা চিনি না। ওরা চিনল। যেহেতু আগে ওদেরকে নিয়ে গিয়েছিল। দুজন অফিসার আসল। ওরা ঐ লাশ দেখেছে। লাশ কী অবস্থায় আছে আমরা তো আর জানি না। আমাদেরকে দেখতেও দিল না। কেউ আসলও না। কোনো একটা জেলের অফিসারও আসল না । ২ নম্বর রুম থেকে মায়া কী কথা বলছে শুনতে পাচ্ছি। দিনের বেলা তো, ১ টা-২ টার সময়। কর্নেল কাদের না কী যেন নাম। তখন তারা ৩ নম্বর রুমে এসে মোজাম্মেলকে ডাকল। ইন্টারোগেশনে তাদের সাথে পরিচয় আগেই। তারা কানে কানে কী কথা বলল। তখন সৈয়দ হোসেন সাহেব বললেন "কী, আপনারা কারা ?" তারা বলল "আপনারা চিনবেন"। কালো চশমাপরা জন বলল "bad days are coming for you. মনে করবেন না সুবিধা পাবেন"। আমাদেরকে ওয়ার্নিং দিয়ে গেল। এই বলে ওরা চলে গেল। চলে যাবার পর ৩ তারিখ রাত গেল মনে হয়। ৪ তারিখ রাতে– লাশটা কবে দেওয়া হয়েছিল ? [পরিবারের কাছে]

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : ৪ তারিখ রাতে।

আব্দুস সামাদ আজাদ : তাহলে ৩ তারিখ রাতে– ৩ তারিখ দিবাগত রাতে– ঠিক সকাল বেলা– ঐ রকম ভোরবেলা-তাহাজ্জুদের নামাজ– তখন আমার জ্বর ছিল ভাবি– ১০৪ ডিগ্রি । তখন তো জ্বর-টর টের পাচ্ছি না। পাচ্ছি না। ঠিক তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত হয়েছে হঠাৎ আমাকে জোহা সাহেব বললেন "জেলার এসেছে। কথা বলবে।" আমার একটু চোখ লেগেছিল। উঠলাম। উঠে জেলারকে বললাম "কেন এসেছেন" ? লক আপটা খুলতে চায় আরকি। তারা সাহস পাচ্ছে না যে বারান্দার লক আপটা খুলে তারা কথা বলবে। কথা তো এমনিই বলা যায়। সবই তো ওপেন শুধু বড় বড় শিক। জেলার বলল "স্যার আমি আপনাদের সাথে একটু কথা বলব।" আমি বললাম "যার যেটা আছে হাতে নাও। আজকে আর খালি হাতে যেতে দেব না।" জেলার বলে "স্যার খবর আছে।" বললাম "কিসের খবর ? সারাদিন কোথায় ছিলেন ?" জেলার বলল "স্যার মিসক্রিইয়েনটদের হাতে এখন ক্ষমতা নাই। ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে। একটু পরেই জানলাম যে তাহেরউদ্দীন ঠাকুর ও [শাহ] মোয়াজ্জেমকে [উভয় মোশতাকের গ্রুপের] এরেস্ট করেছে। তখন বলল "লাশ আমরা আজকে ধোয়াব।" আমি বললাম "লাশ আমাদের দেখতে দেন।" তখন [জেলার] ঘটনাটা বলল। মিলিটারির লোক-অফিসার নয়-চার জন এসেছিল।

শারমিন আহমদ : চারজন মিলিটারি ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : চার জন মিলিটারি। তারা জেল গেটে এসেছিল। ডিআইজি আউয়াল সাহেব বললেন "আমরা তো এভাবে ঢুকতে দিতে পারি না।" তখন তারা বলল "আমরা প্রেসিডেন্টের [মোশতাকের] অর্ডার নিয়ে এসেছি।" তারপর আইজি সাহেবকে আনিয়েছি। আইজি সাহেব প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলল। প্রেসিডেন্ট বলল "তাদের একটা ডিউটি আছে। তাদেরকে ডিউটি করতে বাধা দিয়োনা।" যখন জিজ্ঞেস করলাম "অস্ত্র নিয়ে তারা কী করে ঢুকল ?" তখন [জেলার] বলল "হ্যাঁ, আউয়াল সাহেব তাদেরকে বাধা দিয়েছিল, তখন ডিআইজিকে লিটারেলি চর মারে।"

শারমিন আহমদ : কে চড় মেরেছিল ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : যারা এসেছিল। পরে আমরা শুনেছি। ও [জেলার] বলল "তারা বলেছিল ওনাদেরকে [মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানকে ১ নম্বর রুমে] আনতে। আমরা এনেছি– তারপর তারা ঢুকতেই ব্রাশ ফায়ারে মেরে ফেলে চলে যায়। তারপর আর খবর নাই সারাদিন। আমরাও বুঝতে পারছি না কী করব না করব। সারাদিন গভর্নমেন্ট পাই না কিছু পাই না। এদিকে আইজিও কাউকে পায় না। তো আজকে অর্ডার এসেছে যে দিনের বেলা লাশ ধোয়াব"। আমি বললাম "আমাদের বেডশিট আছে– ভালো ভালো কাপড় আছে [দাফনের জন্য]"। জেলার বলল "না আমরাই ব্যবস্থা করব।" আমি তখন খুব রাগ করেছি। সকাল বেলা তারা লাশ বাইরে নিল। আমরা তো লকআপে। সবাই লকআপে। অন্যরা কিছু দেখতে পেরেছে আমরা তাও পারছি না। ঐ সাইডে [১ নম্বর রুমের কাছে] যারা আছে– সেলে মাহবুব থাকায় সে কিছু দেখতে পেরেছে। টিন শেডে যারা আছে তারাও কিছু দেখতে পেরেছে। তো ৪ তারিখ রাতে শুনলাম যে লাশ ওখানেই পোস্ট মরটেম করেছে। এস.পি মাহবুব ওদিকে এসে, বাইরে থেকে আমার নাম ধরে ডাকল, বলল "সমস্ত মিসক্রিয়েনটরা পালিয়ে গিয়েছে।"

শারমিন আহমদ : কারা মিসক্রিয়েনট ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : ঐ যে রশীদ, ডালিম, ফারুক– বলল "ওরাই এটা করেছে"।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আর মুসলেহউদ্দীন ? [পরে জানা যায় যে এই ঘাতক সুবেদার জেল গেটে মোসলেম নামে স্বাক্ষর করে। প্রকৃত নাম কেউ জানে না। বর্তমানে যদিও সে ১৯৭৫ এর জেল হত্যাকাণ্ডের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত কিন্তু তার কোনো হদিশ গত ৩৮ বছরে পাওয়া যায়নি।]

শারমিন আহমদ : খুনি ঘাতক সুবেদার মুসলেহউদ্দীন এসেছিল ? আরেক জন কে ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : তারা পালিয়েছে।

শারমিন আহমদ : এরা কিন্তু খুনি [ঘাতকরা] আর ওরা হচ্ছে আসল কালপ্রিট [হত্যার চক্রান্তকারীরা]

আব্দুস সামাদ আজাদ : মোসলেহউদ্দীন তো একজন জাত খুনি। পরে শুনলাম তার বাড়ি নাকি টঙ্গীর ঐদিকে।

শারমিন আহমদ : মারা গিয়েছে এ খবর আমি পেপারে পড়েছি [সে সময় বাংলাদেশের কোনো কোনো পেপারে প্রকাশিত হয়েছিল যে জেল হত্যাকারী এই সুবেদার মৃত্যুবরণ করেছে। খবরটি যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে আদালত মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।]

আব্দুস সামাদ আজাদ : সেদিন বলল [এস.পি মাহবুব] যে মিসক্রিয়েনটরা পালিয়ে গিয়েছে– খালেদ মোশাররফ পাওয়ারে এসেছে। [ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। ৫ নভেম্বর মেজর জেনারেলের র‍্যাঙ্ক পড়েন।] তারপর খন্দকার ইলিয়াস এনারা খবর পাঠালেন যে চার তারিখে প্রসেশন। [আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার দাবি করে এই প্রসেশনে খালেদ মোশাররফের মা ও ভাই রাশেদ মোশাররফ যোগ দেন। চার তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত দেশবাসী জানত না যে জেলখানায় মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে] যাই হোক ঐ শুনলাম যে খালেদ মোশাররফ পাওয়ারে। খালেদ মোশাররফকে জিজ্ঞেস করল [জেল কর্তৃপক্ষ] কোথায় লাশ দেওয়া হবে। আমাদেরকে অফিসেও যেতে দেয় না কারো সাথে কথাও বলতে দেয় না– যারা আসে [জেলে কর্মরত] তাদের সাথে কথা বলে [অস্পষ্ট...] আত্মীয়রা জেল গেট থেকে লাশ নিয়ে গিয়েছে। চার তারিখ [রাতে] আমাদের কথায় কথায় জানাল। পাঁচ তারিখ আমি ইন্টারভিউ পেলাম। তখন লাশ বাইরে গিয়েছে। খালেদ মোশাররফ পাওয়ারে এসেছে। এরা পাওয়ারে নাই। একটা চেঞ্জ এসেছে। এরকম একটা অবস্থায় ইন্টারভিউ নিয়েছি। তখন দেখি জেলার ভিতরের দিকে আসছে। তার মন টন ভালোর দিকে। বলে "স্যার সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে।" বললাম "চেঞ্জ আর কী হবে ?" তখন বললেন যে জিয়াউর রহমানকে লক আপ [গৃহবন্দি] করা হয়েছে আর মোশতাক [পাওয়ারে] নাই– এসব বলল। তখন ইন্টারভিউতে গেছি। আমার ফ্যামিলি ইন্টারভিউ। বেগম সাহেব [নূরুন্নাহার সামাদ] বললেন এই এই হয়েছে। তাঁর যা এক্সপেরিএন্স বাইরে থেকে যা যা শুনেছে। তারপর আমি বললাম "আমার কাছে মনে হচ্ছে conspiracy is conspiracy. এখনো কন্সপিরেসি চলছে। যদিও বলা হচ্ছে সব ঠিক আছে, সবাই রিলিজ হয়ে যাবে, আবার ৪ তারিখে প্রসেশনও হয়েছে। বাইরের সব দেখে মনে হয় সবই আমাদের পক্ষে।" ইন্টারভিউতে আমি বলে

দিলাম "এখনো কন্সপিরেসির শেষ হয় নাই। ক্ষমতা যদি আমাদের পার্টির কাছে হস্তান্তর করত তাহলে বুঝতাম যে এরা [অস্পষ্ট] ডিসিপ্লিনড- ঐ আর্মির কাছেই পাওয়ার।" তারপর বললাম "ছেলে-মেয়েদের বাসায় রেখ না। প্রস্তুত থাকা ভালো। কোন সময় কী হয়" এসব বলে [ইন্টারভিউয়ের পর] ভাত খেতে যখন বসেছি দেখলাম জেলার দুইজন লোক নিয়ে ঢুকছে- পি.আই.ডি... সরকারেরই একটা ডিপার্টমেন্ট আছে- এরা ফটো তুলতে এসেছে ঐ রুমের [১ নম্বর] --ক্যামেরাম্যান। জেলার বলল "বাইরের অবস্থা এই- ক্রিমিনালরা পালিয়েছে- খালেদ মোশাররফ পাওয়ারে- মনে হয় cloud is over." আমি যখন [রুমের] বাইরে আসব তখন জেলারের কাছে শুনলাম একটা [জেল হত্যা তদন্ত] কমিশনও হয়েছে জাস্টিস সোবহান, জাস্টিস [মোহম্মদ হোসেন] হোসেন সহ। মনে হয় পরিস্থিতির একটা চেঞ্জ হয়েছে।

সিরিজ ৪

বাইরের গেট থেকে যখন ভেতরে ঢুকছি তখন দেখি জেলারের মন-টন খুব খারাপ। বলে "স্যার শুনছি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে আগ বাড়িয়ে [আর্মি] আসছে- বগুড়া থেকে খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে আরেকটা দল আসছে- কেমন যেন মনে হচ্ছে।" সরকারি খবর তাদের কাছে বেশি আসে। জেলখানায় সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম খবর পাওয়া যায়। এই গেল ৫ তারিখ। আরেকটা থমথমে ভাবের খবর পেলাম। ৫ তারিখ দিবাগত রাতে আবার ওরকম সময় ফায়ারিং, ফায়ারিং খালি গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যায়। আকাশ লাল হয়ে গিয়েছে এসব খবর পাওয়া যায়।

শারমিন আহমদ : আসলে ৬ তারিখ দিবাগত রাত। ৭ নভেম্বর।

আব্দুস সামাদ আজাদ : ৬ তারিখ দিবাগত রাত। ৭ নভেম্বর। ৪ তারিখে প্রসেশন। ৫ তারিখে জানাজা [চার নেতার] ৫ তারিখ সকালে শুনলাম শাহ মোয়াজ্জেম ও তাহেরউদ্দীন ঠাকুরকে এরেস্ট করা হয়েছে। চার তারিখ সন্ধ্যায় তারা [কেবিনেট মেম্বাররা] জানতে পেরেছে। চার তারিখ সন্ধ্যায় কেবিনেট মিটিঙে এই ঘটনাগুলি ঘটে। কিন্তু আগে মিলিটারির মধ্যে ইন্টারনালি কিছু হয়ে গিয়েছে। খালেদ মোশাররফ শাফায়াতকে [কর্নেল শাফায়াত জামিল] নিয়ে গিয়েছে। তারপর তারা কেবিনেট ডাকিয়েছে। খলিল সাহেবও ছিলেন তখন- ৪ তারিখ সন্ধ্যায়- এটা পরে শুনেছি। আমার মনে কিন্তু সবসময় কন্সপিরেসি ইজ কন্সপিরেসি ... -[ভাবনা চলছে] ৬ তারিখে আওয়াজ শুনি- ঐ গুলির আওয়াজ শোনা যায় ঠাস-ঠাস-ঠাস। আওয়াজ বন্ধ হয় না। সকাল হলো।

আমরা চিন্তায় যে কি আরও একটা হলো। সকাল হলো। রোদ উঠল। আস্তে আস্তে জেলখানার চারিদিকে আওয়াজ হচ্ছে। শ্লোগান, প্রসেশন। তো সিপাইরা বলল "এটা সিপাই জনতার উল্লাস।" সিপাইরা তো আর খবর পায় নাই যে এদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে। তখনো তারা ঘটনা জানে না। রবদের জেলখানা [জাসদ নেতা আসম আব্দুর রব ও মেজর জলিল ৮ নভেম্বর রাজশাহী জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন] থেকে ছুটিয়ে আনল ৭ তারিখ সকালে। জাসদের ওয়ার্কাররা আর সিপাইরা একসাথে নেমেছে। নেমে ট্রাক দিয়ে ঘুরে ঘুরে ফায়ারিং করছে। জেলখানার চারিদিকে আওয়াজ শোনা যায়। পরে রাতে শুনলাম কামানের আওয়াজ। সকালে উঠে মনে হয়েছে জেলখানা ঘেরাও হয়ে গিয়েছে । আমরা নিজেদের জীবন নিয়ে চিন্তা করছি যে আমাদের বোধহয় শেষ করে দেবে- এইসব। এই হলো ৭ নভেম্বর সকাল। খালি আওয়াজই শুনি। শুনতে শুনতে শেষ পর্যন্ত ১১ টার দিকে খবর পেলাম যে এরা জেলখানার চারিদিকে যে ফুর্তি করে যায়, এরা আমাদের এগেন্সটে... শুনলাম খালেদ মোশাররফকে মেরে ফেলেছে। খালেদ মোশাররফের ভায়রা বোধহয় [অস্পষ্ট] এয়ারফোর্সে ছিল। পাইলট ছিল। ওদেরকে ফাঁসি দিল। [পরবর্তীতে]

শারমিন আহমদ : আপনি কতদিন জেলে ছিলেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : চার বছর। ৭৯ পর্যন্ত। তারপর আমাকে আবার নিয়ে গেল রাজশাহী জেলে। হেলিকপ্টারে।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : ওনার ওপর টর্চার করেছিল। ইলেকট্রিক শক দিয়েছিল।

আব্দুস সামাদ আজাদ : সুলতান মাহমুদ যে চিফ অব [এয়ার] স্টাফ ছিল সেই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে তো রাজশাহী জেলে নিয়ে গেল। সেলে রাখল বহুদিন। সেখানেও তারা অস্ত্র নিয়ে ঢুকেছিল। ভাবলাম হয়তো মেরে ফেলবে।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : সেলে, যেখানে খুনি আসামিরা থাকে--

শারমিন আহমদ : তখন জিয়ার আমল...

আব্দুস সামাদ আজাদ : সব করল তো জিয়াউর রহমান। ওখান থেকে ৭৭ বা ৭৮ এর শেষে ঢাকায় আনল। তারপর দুইমাস পর পিজি তে। প্রফেসর নুরুল ইসলাম সাহেব ও ব্রিগেডিয়ার মালেক, তারা রেকোমেন্ড করলেন ভর্তিতে।

ভাবি আপনি কনভেনর [আওয়ামী লীগের] হলেন কোন ইয়ারে ?

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : '৭৭এ। তখন খুব আন্দোলন। আপনাকে তখন পিজিতে আনল।

আব্দুস সামাদ আজাদ : তাহলে ৭৭ এর বোধহয় নভেম্বরের শেষের দিকে আমাকে পিজিতে নিয়ে আসল। পুরা ৭৮ থাকলাম পিজিতে। ট্রিটমেন্ট হলো। বোর্ড বসল। ব্রিগেডিয়ার সিরাজ জিন্নাত, ব্রিগেডিয়ার মালেক চিকিৎসা করলেন। নুরুল ইসলাম ছিলেন চেয়ারম্যান। প্রফেসর ইউসুফ আলীও ছিলেন। ঐ সময় ভাবি যেতেন। অন্যান্যরা যেতেন– দেখা হতো। তখন ভাবি পার্টিতে– লিডারশিপে।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : তখন তো পার্টিতে একটা আন্দোলন ছিল– গতি ছিল–

আব্দুস সামাদ আজাদ : তখন তো ওয়ার্কাররা চাঙা হয়েছিল।

শারমিন আহমদ : আমি যখন আম্মার সাথে যশোরে তখন ওয়ার্কারদের মধ্যে সে কী আলোড়ন ! তারা ফুল ফ্লেজড কাজ করছে।

আব্দুস সামাদ আজাদ : জিয়াউর রহমানের সময় বহু আর্মি অফিসার–

শারমিন আহমদ : মেরেছে– তো বলে যে পাঁচ ছয় হাজার লোককে তারা খুন করেছে।

আব্দুস সামাদ আজাদ : খুন করেছে। জেলের ভেতর নিয়ে তারা ফাঁসি দিয়েছে। বগুড়ার আর্মির লোকদের রাজশাহীতে আনল। ওরা ক্যু করেছিল। তাদেরকে হাতে পায়ে চেন দিয়ে আনল। ক্যু উনি নিজেই করালেন। ১৭-১৮ টা ক্যু করালেন ইন কোল্ড ব্লাড।

শারমিন আহমদ : আচ্ছা কাকু আপনার সাথে জেলে আব্বুর কী কী ধরনের কথা বার্তা হতো ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : আমাদের দুজনের মধ্যে এত আন্তরিকতা ছিল কল্পনা করতে পারবে না। কোনো কথা আমাদের দুইজনের মধ্যে গোপন ছিল না। ভবিষ্যৎ, বর্তমান, অতীত। অতীতের ভুল-টুল সমন্ধে আলোচনা হতো। আমরা যেভাবে স্বাধীনতা আনলাম, সেভাবে যদি থাকতে পারতাম তাহলে স্বাধীনতা অন্যরকম হয়ে যেত। এর মধ্যে অনেক কথাই হয়েছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাতেও কনট্রাডিকশনগুলো মোটামুটি সেটল করে এনেছিলাম। মনসুর আলী সাহেব তো বাকশালের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। ভবিষ্যতে তাজউদ্দীন সাহেব পার্টি বিলড আপ করবেন [মনসুর আলী সাহেবের সাথে] এই আলাপ হতো। মনসুর আলী সাহেব তো আমার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন "আপনি তাজউদ্দীনকে বোঝান সে ছাড়া পার্টি হবে

না।" তাজউদ্দীন সাহেব তো খুব straight মানুষ ছিলেন। ঐ যে যারা অয়েলিং করে তারা তো–

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : উনি এগুলো পছন্দ করতেন না।

আব্দুস সামাদ আজাদ : তাজউদ্দীন সাহেব যে সব কথা বলতেন সে গুলি তো ফ্যাক্টলেস ছিল না। লিবারেশনের সময় আমরা কী আন্তরিকতার সাথে কাজ করতাম। এই সময় ছিল তাজউদ্দীন সাহেব সৈয়দ সাহেবকে বুঝিয়ে দিতেন। আমি কমন ম্যান ছিলাম। তারপর ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের সাথে এগ্রিমেন্টটা করলাম দুজনের সিগনেচারসহ। তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে পরামর্শ করে এটা করালাম। লাস্ট যেটা হলো আমি তাজউদ্দীন সাহেব আর সৈয়দ সাহেব– শেষ যেটা হলো–

শারমিন আহমদ : কোন বিষয়ের সিগনেচার এটা ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : ইন্ডিয়ানরা যে এখানে আসবে জয়েন্ট... [বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচাইতে মর্যাদাশীল চুক্তি যাকে বলা যেতে পারে, যাতে বলা হয়েছে যে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পরই মুক্তি বাহিনীর সাথে ভারতীয় মিত্র বাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করবে। বাংলাদেশ সরকার যখনি মিত্র বাহিনীকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে বলবে তখনি তারা বিদায় নেবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন]

শারমিন আহমদ : মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : হ্যাঁ। অ্যালাইড যেটা হলো। আমরা জয়েন্ট অ্যালাইড ফোর্স করলাম। দেখলাম না আসলে পারা যাবে না। এই শাহ মোয়াজ্জেম ওনারা যা করেছেন। বলে যে "আমরা কি দালাইলামা হবার জন্য এসেছি ?" তাজউদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে কত কিছু ষড়যন্ত্র... সেই সময়ই এগুলো হয়েছে।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : [দীর্ঘশ্বাস] কী সব...

আব্দুস সামাদ আজাদ : সেভেন টি ওয়ানের স্বাধীনতার সময় আমরা যখন আগরতলায় গেলাম তাজউদ্দীন সাহেবের ওখান থেকে মেসেজ আমি পেয়ে গেলাম। আমি তো সাধারণ একটা ড্রেসে গিয়েছি কেউ বোঝেনি। এপ্রিলের ৯ তারিখ বোধহয় আগরতলায়। দুপুর বেলা তাহেরউদ্দিন ঠাকুর আর চাষী আলম [মাহবুব আলম চাষী। এই দুই ব্যক্তি মোশতাকের আস্থাভাজন] ওরা তো খুব অ্যাকটিভ ছিল, আমাকে বলে "সামাদ ভাই আপনি একটু এগিয়ে আসেন"। অন্যান্য এম.পিরাও আছে। মিজানুর রহমান চৌধুরীরা ক্যালকাটায়। মনে করেছে ওখানে কেবিনেট হবে। আমরা সিলেট, কুমিল্লার, ঐ সাইডে যারা ছিল

সব রয়ে গেল। কিন্তু মেইন লিডাররা তারা চলে গেছে ক্যালকাটায় তাড়াতাড়ি। তারা মনে করেছে ওখানে ক্যাবিনেট হয়ে যাবে। তো আমি গিয়েই বললাম "একটা গভর্নমেন্ট ফর্ম করতে হবে না হলে হবে না।"তখন এটা শুনেই তাহেরউদ্দিন ঠাকুর বলে যে "একটা অফিস আমরা খুলেছি। সিঁড়ির নিচে একটা অফিস।" রাত আড়াইটার সময় চাষী আলম এসে বলে "স্যার একটু ঘুরে আসি। উনি এসে গেছেন"। "কে এসে গেছেন ?" যেয়ে দেখি মোশতাক সাহেব টুপি-আচকান পরে শুয়ে আছে উপর তলায়।

শারমিন আহমদ : কোথায় শুয়ে আছে ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : আগরতলার একটা বাড়িতে- যে বাড়িতে আমরা থাকি আরকি। এর আগেই কিন্তু একটা অফিস করেছে আমাদেরসহ। বলে অফিস করে আপনাকে নিয়ে অগ্রসর হব। কাজের জন্য সেন্ট্রালাইজ করব।।" সন্ধ্যার দিকে আমি, জেনারেল ওসমানী [তখন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। ১০ এপ্রিল প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর জেনারেল পদে উন্নীত] ও মোশতাক রেস্টহাউসে গেলাম। লক্ষ করলাম মোশতাকের হাবভাব। যেন নিজেই গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার করবে।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : ওদিকে কিন্তু ফার্স্ট এপ্রিল ইন্দিরা গান্ধীর সাথে কথা হয়। [১ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ দিল্লিতে পৌঁছেন এবং ৩ এপ্রিল নয়া দিল্লিতে, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ওনার ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার হয়। সেদিন তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলেন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একান্ত বাংলাদেশেরই। এই যুদ্ধ করবে বাংলাদেশের মুক্তিকামী যোদ্ধা-জনতা। এই যুদ্ধের আন্তর্জাতিকীকরণ তারা চান না। তিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিঃশর্তভাবে সহযোগিতা লাভের জন্য অপর এক স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছে এসেছেন।]

আব্দুস সামাদ আজাদ : ওটা আরেক চ্যাপ্টার। আমার চ্যাপ্টার আমি বলছি। ওখানে যেয়ে বসলাম। অন্য এম.পিরা আসল। তাজউদ্দীন সাহেব সৈয়দ সাহেবকে আনল তুরা থেকে। [১১ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ সৈয়দ নজরুল ইসলামের সন্ধান পান। তিনি তাকে ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা এবং তাঁকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি করে ক্যাবিনেট গঠনের কথা জানান। তারপর তাঁকে নিয়ে বিএসএফের ডাকোটা প্লেনে আগরতলায় ফেরেন] মনসুর আলী সাহেবকেও আনল একটা মিলিটারি প্লেনে।

শারমিন আহমদ : তুরা ?

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : হ্যাঁ তুরা...-

আব্দুস সামাদ আজাদ : তুরা পাহাড়। ময়মনসিংহর বর্ডারে-–

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : ওখান থেকে আনল নজরুল ইসলামকে...

আব্দুস সামাদ আজাদ : ওখান থেকে নিয়ে আসল আগরতলায়। আমরা মোটামুটি চাইছিলাম তেলিয়াপাড়া সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া- সিলেটের বর্ডারে তেলিয়াপাড়া একটা বাগান আছে সেখানে আমরা হেডকোয়ার্টার করব। ওখানে যারা ছিলাম আরকি। পাকিস্তান আর্মি ঢুকতে পারে নাই। চারিদিকে বাগান-টাগান আছে। তেলিয়াপাড়া লাস্ট স্টেশন সিলেটের। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বর্ডারে। কুমিল্লার বর্ডারে। তেলিয়াপাড়া লিবারেটেড তো। জেনারেল রব সাহেব বললেন "তেলিয়াপাড়াটা ভালো।" তখন তাজউদ্দীন সাহেব ওনারা এসেছেন। তখন তাজউদ্দীন সাহেব রিপোর্ট করলেন যে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাঁর দেখা হয়েছে। মোশতাক তখন বুঝল যে ঘটনা তো হয়ে গিয়েছে। উনি চট করে উঠে সালাম দিয়ে বললেন "আসি।"

শারমিন আহমদ : ১০ তারিখ একথা তাজউদ্দীন সাহেব জানালেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : ৯ তারিখ রাতে। ১০ তারিখ পরে আসবে।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : ১০ তারিখে তো রেডিওতে অ্যানাউন্স হলো [বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা, সরকারের নীতিমালা, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন, পাকিস্তান সরকারের গণহত্যা সম্পর্কে বহির্বিশ্বকে অবহিত করা এবং বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে বিশ্ববাসীর সমর্থন লাভ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ১০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ভাষণ দান করেন।]

আব্দুস সামাদ আজাদ : ৯ তারিখ সন্ধ্যায় খবর পেয়ে আমি মোশতাককে বললাম "মোশতাক সাহেব আপনি ওঠেন।" আমি তো ঠিক সময়ে শক্ত হই।

শারমিন আহমদ : উনি কী বললেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : উনি উঠে গেলেন। আমাদের আলাপের মধ্যে তাজউদ্দীন সাহেব রিপোর্ট করলেন যে এই হয়েছে। উনি রিপোর্ট করলেন মিসেস গান্ধীর সাথে দেখা করার কথা। বললেন এখন কী করা দরকার। আমি বললাম "বঙ্গবন্ধু যখন অনুপস্থিত তাকে প্রেসিডেন্ট করা ছাড়া উপায় নাই। কারণ উনি তো উপস্থিত হয়ে পার্টিসিপেট করতে পারবেন না। আর ডেপুটি লিডার উনি [সৈয়দ নজরুল ইসলাম] ওনাকে অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট আর তাজউদ্দীন সাহেব -বাকি সেক্রেটারি- এটা একটা কথা আলাপ করছি, এর মধ্যে উনি উঠে গেলেন "স্লামালাইকুম" বলে। আমি বললাম "মোশতাক সাহেব বসেন। সমস্ত দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে- কী করব না করব- একটা জায়গায় তো আসতে হবে।" বগুড়াও ফল করে যাচ্ছে । কুষ্টিয়ার মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা তখনো ফ্রি ছিল। কর্নেল ওসমানী ডিক্লেয়ার করল আমাদের চুয়াডাঙ্গায় হেডকোয়ার্টার করার কথা।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : চুয়াডাঙ্গার ওসমান– মেজর ওসমান [মেজর আবু ওসমান চৌধুরী কুষ্টিয়ায় পাকিস্তান সেনাদের বিরুদ্ধে অসম সাহস ও বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন]

আব্দুস সামাদ আজাদ : হ্যাঁ, হ্যাঁ। ডাক্তার আসহাবুল হক তারাও সেখানে একটা ডিক্লারেশন দিয়ে দিল যে ওখানে হেড কোয়ার্টার হবে। [বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী চুয়াডাঙ্গায় হবে এই ঘোষণাটি উচ্ছ্বাসের বসে ফাঁস করে দেওয়ার ফলে পাকিস্তান সেনারা চুয়াডাঙ্গায় বোমা বর্ষণ করে। এর ফলে ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে প্রথম বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের কথা গোপন রাখা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী ঐ স্থানের নামকরণ করেন "মুজিবনগর"।] ঠিক হলো আমরা বসব আবার। ভোর হয়ে গিয়েছে তো– সকাল হয়ে গিয়েছে। একটা বাংলো গেস্ট হাউস ছিল– সেখানে আমাকে নিয়ে গেল। সেখানে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আলাপ করলাম। ঠিক হলো সৈয়দ সাহেব, মনসুর আলী সাহেব, আর আমি, আমরা তিনজন মিলে ডিসাইড করব কী করা যায়; আমাদের মধ্যে মিনিস্টার কে হবে, কী করা না করা যায়...

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আর কামরুজ্জামান সাহেব ? [উনি তখন কলকাতায়]

আব্দুস সামাদ আজাদ : তাজউদ্দীন সাহেব বললেন "আপনারা বসেন বসে ডিসাইড করেন।"

শারমিন আহমদ : ডিসাইড করবেন কী ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : সরকার গঠন করা। কারণ একটা সিদ্ধান্তে যেতে হবে তো।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : মানে লবি কনটিনিউ ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : মানে একটা লাইনে আনতে হবে তো। ভোর বেলায় মান্নান [আব্দুল মান্নান এম.পি] সাহেবকে বললাম "মান্নান সাহেব একটা গভর্নমেন্ট না করলে হবে না।" তখন সৈয়দ সাহেব, মনসুর আলী আর আমি বসলাম। এইভাবে সারাদিন গেল। এই ৩টা ৪টার সময় সৈয়দ সাহেব বললেন "কীভাবে গভর্নমেন্ট হবে ?" আমি বললাম "একটা তো হাইকমান্ড আছে আমাদের। বঙ্গবন্ধু– যারা অফিস বেয়ারার ছিলেন তাদেরকে নিয়ে ডিল করেছেন। তাজউদ্দীন সাহেব সেক্রেটারি– সবসময় ওনার সঙ্গে ছিলেন। আপনি আছেন। মনসুর আলী সাহেব এখনও ভাইস প্রেসিডেন্ট, মোশতাক ভাইস প্রেসিডেন্ট, কামরুজ্জামান সাহেব অল পাকিস্তানের [আওয়ামী লীগ] সেক্রেটারি। এর বাইরে গেলে কিন্তু সবাই মিনিস্টার হতে চাবে। এত

মিনিস্টারের তো দরকার নাই। এনাদের তো কোনো ডিউটি নাই, ফাংসান নাই।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : এটা তো ওয়ার টাইম ।

আব্দুস সামাদ আজাদ : হ্যাঁ এটা ওয়ার টাইম। সৈয়দ সাহেবকে আমি বললাম "আপনার একটা কনস্টিটিউশনাল ভূমিকা আছে সেটা হলো পার্টিগতভাবে আপনি অ্যাকটিং ভাইস প্রেসিডেন্ট। দলীয়ভাবে আপনি ডেপুটি লিডার ইলেক্টেড। ইলেক্টেড মেম্বাররা আপনাকে ডেপুটি লিডার করে রেখেছে। সুতরাং আমরা দুইমাস পরে সংসদের মেম্বারদের ডাকব এবং এই গভর্নমেন্ট কে আমরা কনফিডেন্স দেব।" এই বলে আমরা বাইরে গেলাম। তাজউদ্দীন সাহেব তো ওপরে রয়েছেন। তারপর আমরা তিন চারজন আবার বসলাম। কিন্তু মোশতাক আসে না। তখন তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এসে আমাকে একটা কথা বলল "সামাদ ভাই, একটা কাজ করেন, আমরা বিদেশে আছি– এখন তো সারভাইব করার ব্যাপার– ওকে [মোশতাককে] একটা পজিশন দিয়ে দেন– ফরেন মিনিস্টারের।

শারমিন আহমদ : আহহা !

আব্দুস সামাদ আজাদ : তাজউদ্দীন সাহেব, আমি, সৈয়দ সাহেব, কামরুজ্জামান আসেননি– উনি ক্যালকাটায় ছিলেন। আমরা চারজন [মনসুর আলীসহ] মান্নান সাহেবকে ডাকলাম। ডেকে বললাম "ঠিক আছে দিয়ে দেন।" তাকে বাদ দিলে আবার মনে করবে আমরা যেন ...

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : তাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা।

সিরিজ ৫

আব্দুস সামাদ আজাদ : রাতে, সন্ধ্যার পর সমস্ত এম.পিদের– যারা ছিল ওখানে ডেকে ক্যাবিনেট ঘোষণা করা হলো। ওখানে ইন্ডিয়ান চ্যানেল যারা ছিল তারা বলল "ক্যাপিটাল ওদিকে হবে ক্যালকাটার সাইডে-ওয়ার্ল্ড টা ওদিকে, এই আগরতলার দিকে পড়লে যোগাযোগের অসুবিধা। [প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর, যার নামকরণ তাজউদ্দীন আহমদ করেছিলেন, তা ছিল মেহেরপুরে, বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে। তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন যে যুদ্ধাবস্থায় সরকার যেখানে যাবে তার নাম হবে মুজিব নগর] পরদিন গভর্নমেন্ট ঘোষণা করা হলো। গেলাম ক্যালকাটা। জায়গা পাওয়া যায় না। বিএসএফের কী নাম ছিল ? গোলোক রায় ?

শারমিন আহমদ : গোলোক মজুমদার [বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের আইজি]

গোলোক মজুমদারের হেড অফিসে আমরা থাকতাম। সেখানেই আমরা গভর্নমেন্ট ফর্ম করলাম। গভর্নমেন্ট তো আর বাইরে যেতে পারে না– ইন্ডিয়ার ভেতরে কাজ–। তখন আমরা স্ট্যান্ড নিলাম যে আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাথে যোগাযোগ করব। ঐ মিসেস গান্ধীর সাথে দেখা হলো আবার। তারা বাইরের জগতে [বাংলাদেশের পক্ষে] প্রোপাগান্ডা করবে। থিয়েটার [৮ নম্বর] রোডে হেড অফিস করা হলো। থাকবার জায়গা যেটা আমি সেটা আরও পরে পেয়েছি। "ভাবি আপনি তখনো আসেননি।"

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আমি গেলাম মে মাসের একদম লাস্টে। [২৫ মে, ১৯৭১ মৃত্যু তালিকাভুক্ত বেগম তাজউদ্দীন, চার নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে, পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর চক্ষু এড়িয়ে সীমান্ত পার হন]

আব্দুস সামাদ আজাদ : ঐ মে মাসেই এটা হলো। অফিস হলো ঐ থিয়েটার রোডে। তাজউদ্দীন সাহেব ঐ থিয়েটার রোড ছাড়েননি। [তাজউদ্দীন আহমদ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি পারিবারিক জীবন-যাপন করবেন না। রণাঙ্গনে যোদ্ধারা যদি পরিবার ছেড়ে থাকতে পারেন, তাহলে তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের প্রধানমন্ত্রী হয়ে কেন পারবেন না। পার্ক স্ট্রিটের ৮ নম্বর থিয়েটার রোড ছিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বাসস্থান। অফিস কক্ষের পাশেই একটি রুমে তিনি থাকতেন। নিজের কাপড় নিজেই ধুতেন এবং আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করে তিনি স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন]

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : ২৭ মে যেয়ে উঠলাম। [আগরতলা হতে কোলকাতায়]

আব্দুস সামাদ আজাদ : [আমাকে উদ্দেশ্য করে] তোমরা যে বাড়িতে উঠলে– সে বাড়িতে তাজউদ্দীন সাহেব দিনের বেলা খালি দেখা করে আসত।

শারমিন আহমদ : দিনের বেলায়ও যেত কিনা– দুবার বোধহয় গিয়েছিল [এক মাত্র পুত্র দেড় বছরের শিশু সোহেল মারাত্মক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাজউদ্দীন আহমদকে সে খবর জানালে তিনি দেখতে যেতে অপারগতা জানিয়ে বলেন যে তার পুত্রকে তিনি অন্য সবার পুত্র থেকে আলাদা করে দেখেন না। যুদ্ধাবস্থায় তার কাছে সব শিশুই সমান। পরে গোলোক মজুমদার এবং বিএসএফের নিরাপত্তা অফিসার শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের পীড়াপীড়িতে তিনি অসুস্থ পুত্রের শিয়রে অল্প কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে দোয়া করে চলে আসেন। দ্বিতীয়বার ৬ ডিসেম্বর, ভারতের বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দিন, তার পরিবারের উল্টা দিকের ফ্ল্যাটে, সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাথে মিটিং সেরে যাবার পথে তিনি কয়েক মিনিটের জন্য পরিবারের সাথে দেখা করে অফিসে চলে যান।]

আব্দুস সামাদ আজাদ : উনি কিন্তু অফিস ছাড়লেন না। বললেন "লিবারেশন না হলে যাব না।" সৈয়দ সাহেব– ওনারা গেলেন ওখানে। [মন্ত্রী পরিষদের পরিবারদের জন্য ভারত সরকার, পার্ক সার্কাসে ড. সুন্দরী মোহন এভিনিউতে বসবাসের ব্যবস্থা করে। ওখানেই বাকি মন্ত্রীরা পরিবারসহ থাকতেন] ওখানে বসেও– ঐ বাড়িতে বসেও কন্সপিরেসি হয়েছে। তারপর শিলিগুড়ি গেলাম– সমস্ত এম.পিদের ডাকা হলো [জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত শিলিগুড়ির এই সম্মেলনে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ সরকারকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি ও তার অনুসারী ছাত্র নেতাদের প্রচণ্ড বিরোধিতা এবং মোশতাকের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও এই সম্মেলন সফল হয়। মোশতাক ও মনি বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করে]

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : কন্সপিরেসি কারা করল ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : মোশতাকরা। সে তো পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার নিজ হাতে রেখেছে। মোশতাক নো কনফিডেন্সের চক্রান্ত করেছিল। তারপর বিভিন্ন জেলার সাথে আলাপ করে সৈয়দ সাহেবকে বললাম। সৈয়দ সাহেবের তো কী পজিশন। সৈয়দ সাহেব করলেন কী ওখানে [শিলিগুড়ি] যাবার পরে বক্তব্যটা খুব কড়া ভাবে দিলেন যে "আমরা এখন সংগ্রামে যাচ্ছি"...

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : তখন এই গভর্নমেন্টের এগেন্সটে একটা ইয়াং বাহিনীকে [মুজিব বাহিনী] মোশতাক তার দলে রেখেছিল।

আব্দুস সামাদ আজাদ : সেটা তো পরে– তারপরে সেখানে পারল না– দেখল সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। সৈয়দ সাহেবের বক্তব্য...

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : সৈয়দ সাহেব তখন খুব strong ছিলেন-

আব্দুস সামাদ আজাদ : খুব strong। তাঁর সাথে বহু আলাপ হয়েছে। সৈয়দ সাহেবকে বোঝালে উনি কিন্তু খুব strong থাকতেন।

শারমিন আহমদ : সৈয়দ সাহেব কোথায় বক্তৃতা দিলেন ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : শিলিগুড়িতে। পার্লামেন্টারি পার্টির মিটিং ডাকলেন। একটা নিয়ম আছে। একটা কন্সটিটিউশনাল পজিশন দিতে হবে তো। ইলেক্টেড গভর্নমেন্টের যারা মেম্বার আছে তারা একটা কনসলিডেটেড প্রস্তাব পাস করল যে এই সরকার প্রভিশনাল সরকার। এর আগে ১৭ এপ্রিল আমরা মুজিবনগরে গভর্নমেন্ট ঘোষণা করলাম।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : শপথ নিলাম মুজিবনগরে। [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান]

আব্দুস সামাদ আজাদ : ইউসুফ আলী তো আগে জানতেনই না। তাঁকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছি। পড়বার [স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র] সময় তাঁর হাতে দিয়েছি। কেউ একজন ঘোষক কেউ একজন পাঠক। এগুলো তো কয়েকজন মিলে– দুই-তিন জন মানুষ মিলে আমরা করেছি। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস তো আছেই একের পর এক।

শারমিন আহমদ : আমরা যাতে একতাবদ্ধ থাকি, এখন এই সরকারে যোগদান করি এটার পক্ষে সৈয়দ সাহেব বক্তব্য রাখলেন...

আব্দুস সামাদ আজাদ : সৈয়দ সাহেব বক্তব্য রাখলেন যে "আমরা struggle এ আছি আমরা [সম্মিলিতভাবে] যা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাই হবে-- [এম. পিদের উদ্দেশে] আপনারা যার যার এরিয়ায় যান, জোনাল কমিটি করেন-" যা যা প্রোগ্রাম ছিল তার পক্ষে কড়া বক্তব্য দেন। তারপর মনসুর আলী সাহেবকে বলেন "আপনি প্রিজাইড করেন"। মনসুর আলী সাহেব প্রিজাইড করলেন। মনসুর আলী সাহেবও শক্ত ছিলেন। মোশতাকের কন্সপিরেসি ঐভাবে ভেঙে যায়– নো কনফিডেন্স আনার তার ক্ষমতাই নাই– ঐ লাইনেই আসল না ...

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : পারল না। চেষ্টা করেছিল– পারল না।

শারমিন আহমদ : এরকম হীন তো মোশতাক ছাড়া কেউ ছিল না ?

আব্দুস সামাদ আজাদ : নাহ ! হি ইজ দি হীন।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : সব খেলোয়াড়ের একটা মাস্টার লিভার থাকে না !

তোমার আব্বুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মুজিব হত্যার পর সামাদ সাহেব যদি ছাড়া থাকতেন তাহলে উনি কারেক্ট ডিসিশন নিতে পারতেন। পার্টিটাকে ঠিক রাখতে পারতেন।

সিরিজ আকারে প্রকাশিত বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম : ঢাকা
২১ ডিসেম্বর, ২০১৩-২৫ মার্চ, ২০১৪

বাংলাদেশের দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকাও সিরিজ আকারে
উল্লিখিত সাক্ষাৎকারটি ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৩ হতে প্রকাশ শুরু করে।

৩ নভেম্বর ১৯৭৫
জেল হত্যা তদন্ত কমিশনের সদস্য
সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস কে. এম. সোবহানের সাক্ষাৎকার
৭ জুলাই ১৯৮৭
ট্রান্সক্রাইব : মনসুর আলী

লেখক ও তার মা, আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনসহ জাস্টিস সোবহানের মালিবাগের বাসস্থানে সাক্ষাৎকারটি টেপ-এ ধারণ করেন।

শারমিন আহমদ : জেল হত্যার তদন্ত সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য কী ?

জাস্টিস সোবহান : প্রথম কথা হচ্ছে যে ৫ নভেম্বর ১৯৭৫ গেজেট নোটিফিকেশন হলো এবং আমরা ৬ তারিখ সকালে জানতে পারলাম যে আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে ঐ কমিশনের একজন সদস্য হিসেবে।

শারমিন আহমদ : গেজেট নোটিফিকেশন কী ?

জাস্টিস সোবহান : ৫ নভেম্বর গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছিল। জাস্টিস আহসান চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে, আমাকে এবং লেট সৈয়দ মহম্মদ হোসেনকে সদস্য করে একটা কমিশন করা হয়েছে। সেই কমিশন জেল হত্যার তদন্ত করবে। তো, আমি যখন সকালে খবরটা রেডিওতে শুনলাম, ৬ তারিখে আমি কোর্টে গিয়ে আহসান চৌধুরীকে বললাম এখন তো আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি, কারণ যে-সমস্ত এভিডেন্স থাকবে সে-সমস্ত নষ্ট করার চেষ্টা করবে, কাজে কাজেই আমাদের উচিত এক্ষুণি কাজ আরম্ভ করে দেওয়া। তো, উনি বললেন, দাঁড়াও, দেখি কী হয়, এরকম বললেন। তারপর তো ৭ তারিখ থেকে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল। তখন খালেদ মোশাররফ ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। তাকে তো মেরে ফেলা হলো। কাজেই তদন্ত কমিশনের কোনো কাজই হয়নি। ঐ কাগজে শুধু নিয়োগ ব্যবস্থাটা হয়েছিল। কিন্তু তারপর কাজ কিছুই হয়নি।

শারমিন আহমদ : তার মানে ব্যাপারটা একেবারেই কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ ছিল ?

জাস্টিস সোবহান : হাঁ, কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঐ গেজেট নোটিফিকেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

শারমিন আহমদ : তারপর আপনারা কি নিজেরা কোনো ধরনের চেষ্টা করেননি ?

জাস্টিস সোবহান : না, চেষ্টা করার তো প্রশ্নই উঠল না। তারপরই তো জিয়াউর রহমান পাওয়ারে চলে এল। জিয়াউর রহমান ডেপুটি চিফ মার্শাল ল' অথরিটি হয়ে গেল। সে আসার পর স্রোত তো একেবারে উল্টোদিকে ঘুরতে লাগল। কাজে কাজেই আমাদের পক্ষে আর কোনো কিছুই করা সম্ভব হলো না।

শারমিন আহমদ : আপনি কি আওয়ামী লীগের সদস্য ?

জাস্টিস সোবহান : না, না।

শারমিন আহমদ : আপনাদের মধ্যে যাঁরা আছেন লিগ্যাল ডিপার্টমেন্টে তাঁরা কি এধরনের কোনো আলোচনা করেছেন যে এই ইস্যুটাকে নিয়ে কিছু তোলপাড় করার বা পার্টির সাথে [আওয়ামী লীগ] যোগসাজশ করার বা প্রেসার করার যে তোমরা পার্টির তরফ থেকে ইস্যুটাকে আবার চালু করো ?

জাস্টিস সোবহান : না, সে-রকম কোনোকিছু করা হয়নি। কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি একটা এফ.আই.আর (ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট) বোধহয় করা হয়েছিল লালবাগ থানায়।

শারমিন আহমদ : আর লালবাগ থানায় যে এফ.আই.আর. করা হয়েছিল সেটা কারা করেছিল সে-সম্বন্ধে কিছু জানেন ? [তৎকালীন ডি.আই.জি. প্রিজন্স আব্দুল আউয়াল লালবাগ থানায় কেস করেছিলেন এবং তা সরকার নিষ্ক্রিয় করে রাখে। ১৯৯১ সালে সহদরা সিমিন হোসেন রিমিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিষয়টি উল্লেখ করেন তৎকালীন ডিআইজি প্রিজন্স আব্দুল আউয়াল। সাক্ষাৎকারটি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে অবসরপ্রাপ্ত ডি.আই.জি'র বাসস্থানে ধারণ করা হয়।]

জাস্টিস সোবহান : তা বলতে পারব না।

শারমিন আহমদ : ডঃ কামাল হোসেন আমাকে বলেছিলেন যে এরকম একটা এফ.আই.আর. হয়েছিল কিন্তু ওটার পরে কী হলো তিনি সে-বিষয়ে কিছু বলতে পারলেন না। কারণ এফ.আই.আর-এর কাজ কিছুই চালু হয়নি। কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

জাস্টিস সোবহান : কাজ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ জেল হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এল তারা তো জেল হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল। কাজে কাজেই জেল হত্যার অনুসন্ধান তো অসম্ভব। তদন্ত তো অসম্ভব। কারণ প্রথমে যেটা করা যেত, ধরা যেত, ঐ এয়ারপোর্টের কাগজ যদি সিজ করা যেত এবং জেলের কাগজ যদি সিজ করা যেত। কারণ আমি যা শুনেছি জেলে তো একটা চিরকুট ডি.আই.জি-কে দেওয়া হয়েছিল। যে চিরকুটে লেখা ছিল 'এদের ভেতরে ঢোকার পারমিশন দেয়া হোক।' কারণ এদের [হত্যাকারীদের] জেলে প্রথমে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আমি খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রাইভেট কিছু খবর নিয়েছিলাম। তাতে বলেছিল যে একটা ছোট চিরকুটে লেখা ছিল যে চিরকুট-বাহককে জেলের ভেতর ঢুকতে দেয়া হবে। এবং সেই চিরকুটের জোরে তারা ভেতরে ঢুকেছিল। তারা [জেল কর্তৃপক্ষ] সেই চিরকুটকে বিশ্বাস করেনি। তারা মোশতাককে টেলিফোন করেছিল। মোশতাক তখন বলল যে 'হ্যাঁ, ওটা আমার লেখা চিরকুট। ওদেরকে ভেতরে যেতে দাও।' এই পর্যন্ত (কাজ) হয়েছিল। তারপর তো যারা খুন করল তাদের সঙ্গী-সাথিরা ক্ষমতায় এল। তাই ও-ব্যাপারে তখন করার কিছু ছিল না। একমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন করতে পারত ওর বিরুদ্ধে। তাছাড়া আইনত যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সে পদক্ষেপ তখন নেওয়া সম্ভব ছিল না। পুলিশের পক্ষেও সম্ভব ছিল না এবং অন্য কারুর পক্ষেও সম্ভব ছিল না।

শারমিন আহমদ : আপনি কি মনে করেন এখন ডি.আই.জি-কে পেয়ে তার কাছ থেকে কথা নেওয়া সম্ভব ?

জাস্টিস সোবহান : হ্যাঁ, তখন যিনি ডি.আই.জি. ছিলেন আমার মনে হয় তিনি বোধহয় রিটায়ার করে গেছেন। তিনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন কী ঘটনা ঘটেছিল।

শারমিন আহমদ : তাঁর সাথে কীভাবে যোগাযোগ করা যেতে পারে ?

জাস্টিস সোবহান : তাঁর নাম তো জানতে পারেন।

শারমিন আহমদ : নামটা আমি পেয়েছি। নাম হচ্ছে আউয়াল।

জাস্টিস সোবহান : নাম পেলে তো ঠিকানাও পেতে পারেন।

[অবসরপ্রাপ্ত আব্দুল আউয়ালের ঠিকানা বহুকষ্টে যোগাড় করে তাঁর সাক্ষাৎকারটি সহদরা রিমি গ্রহণ করে ১৯৯১ সালে। তিনি তখন চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে অবসর জীবনযাপন করছিলেন]

শারমিন আহমদ : জেল হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দেবার অবশ্যই চেষ্টা করবে। যেহেতু খুনিরা দেশে এবং খন্দকার মোশতাক প্রকাশ্যে চলাফেরা করছে। কিন্তু এই ইস্যুটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া দেওয়া দরকার।

জাস্টিস সোবহান : বর্তমানে ব্যাপারটা এখন রাজনৈতিক। রাজনৈতিক যদি হয় তাহলে সে রাজনৈতিক ব্যাপার রাজনৈতিক দলকেই করতে হবে। অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দল, যতটুকু জানি, তাদের লিগ্যাল ডিপার্টমেন্ট আছে, ল'ইয়ার আছে, তাদের সাহায্য নিয়ে [করতে হবে] মূলত ব্যাপারটাকে রাজনৈতিকভাবে দেখাতে হবে। রাজনৈতিকভাবে না দেখলে তো সম্ভব না।

শারমিন আহমদ : আপনি কি মনে করেন এই যে এফ.আই.আর. করা হলো এর ভিত্তিতে নতুন তদন্ত কমিটি কি আবার বসবে ?

জাস্টিস সোবহান : আমার তাতে সন্দেহ আছে। যারা খুন করেছে তারা তো আর্মির লোক। তো আর্মির লোক যদি খুন করে থাকে, যেমন ফারুক সে এখন দেশে আছে। তারপর বজলুল হুদা এরা তো প্রকাশ্যে বলছে যে তারা শেখ সাহেবকে – বঙ্গবন্ধুকে খুন করেছে। কেউ তো জিনিসটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে না। প্রকাশ্যে একজন লোক যদি বলে আমি খুন করেছি, তবে সেই খুনিকে আইনত তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে সরকার বাধ্য।

শারমিন আহমদ : মোশতাক অর্ডিনেন্স জারি করল যে '৭৫-এর ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের বিচার হতে পারবে না। (পরে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তা স্থায়ী করে নেন)। এটা আইনগতভাবে পাল্টাবার অধিকার কি তাদের আছে ?

জাস্টিস সোবহান : আইন যদি পাল্টিয়েও থাকে, যদি ধরে নেওয়া যায়, তাহলেও প্রশ্ন হচ্ছে যে যেভাবে সংবিধান পাল্টিয়েছে, সেই আইন কি সত্যি এটা বন্ধ করেছে ? আমার রিডিং এবং আমি অনেক জায়গায় আমার বক্তব্যও রেখেছি যে – যে আইন করেছে সে আইনে জেলহত্যার বিচার বন্ধ হতে পারে না। বিচার চলবে কারণ যেভাবে আইন করেছে, সেভাবে হত্যার বিচার বন্ধ হয়নি। কাজে কাজেই কেউ যদি বিচার করতে চায় তাহলে ঐ সংবিধানে যে পরিবর্তন করা হয়েছে সেটা বাধা হবে না।

শারমিন আহমদ : সংবিধান তো ১৫ আগস্টের [হত্যাকাণ্ড] ওপর পরিবর্তন করা হয়েছিল, কারণ তখন খুনিরা দুইমাস পাওয়ারে ছিল, মোশতাক ছিল। ৩ নভেম্বরের পরপরই মোশতাক ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং তারপর খুনিরা সাথে সাথেই পালিয়ে যায়। হত্যাকাণ্ডের পর পরই।

জাস্টিস সোবহান : সুতরাং তারা খুব একটা সময় পায়নি। হয়তো তারা (ক্ষমতায়) থাকলে সেটাও করতে সচেষ্ট অবশ্যই থাকত।

শারমিন আহমদ : কিন্তু ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড, যা তারা সংশোধনীতে আনল যে তাদের বিচার করতে পারা যাবে না, এই আইন যে তারা আনল, এটা কি কোনো দেশের আইনে আনা যায় ?

জাস্টিস সোবহান : আইনত আনা যায় না। কিন্তু এখন যেভাবে সপ্তম সংশোধনী (জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে, সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে চিফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে তার সব কর্মকাণ্ডকে বৈধ করে নেন) করা হয়েছে, তার আগে পঞ্চম সংশোধনী সেভাবেই করেছে। জিয়া করেছেন। জিয়ার মার্শাল ল'তে ঐ '৭৫-এর ১৫ আগস্ট থেকে '৭৮-এর শেষ পর্যন্ত যা করেছে সমস্ত ভ্যালিডেট করল। এবং তাতেই ঐটা ভ্যালিডেট হয়ে গেল।

শারমিন আহমদ : এটা জিয়াউর রহমানের আমলে হয়েছে ?

জাস্টিস সোবহান : হ্যাঁ। এটা জিয়ার আমলে হয়েছে। এই পঞ্চম সংশোধনী।

শারমিন আহমদ : তারপর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেও তো করলেন যে, সংবিধানে ছিল যে আপনারা যারা সরকারি চাকুরিরত তাঁরা ইলেকশনে নামতে পারবেন না, কিন্তু উনি তো CMLA থেকেই সরকারি বেতনভুক্ত অবস্থায় ইলেকশনে contest করলেন।

জাস্টিস সোবহান : আমি তখন দেশে ছিলাম না। কিন্তু আমি যেটা শুনেছি যে সে contest করেছিল। (প্রথমে) একটা গেজেট ছাপাল ব্যাক- ডেট দিয়ে। ব্যাক-ডেট দিয়ে গেজেট ছাপিয়ে তখন তিনি রিজাইন করে গেলেন।

শারমিন আহমদ : আচ্ছা, আচ্ছা ! আগেই তিনি রিজাইন করেছেন ?

জাস্টিস সোবহান : হ্যাঁ। গেজেট ছাপালেন পরে। রেজিগনেশনের পরে।

শারমিন আহমদ : আপনার সাথে কি তাজউদ্দীন আহমদের পরিচয় ছিল ?

জাস্টিস সোবহান : ঘনিষ্ঠ কিছু নয়। সামান্য পরিচয় ছিল।

শারমিন আহমদ : আপনার যে চাকরিটা গেল, কী কারণে গেল ?

জাস্টিস সোবহান : কারণ তো তারা কিছু বলেনি। কিন্তু কারণ পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে জিয়াউর রহমানের সময় মার্শাল ল'কে চ্যালেঞ্জ করে কতগুলো কেস ফাইল করা হয়। প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে মার্শাল ল' ও সংবিধান, যখন দুটি বিষয় পাশাপাশি আসবে, তখন কোনটা বলবত থাকবে বেশি ? সেখানে আমার বক্তব্য ছিল যে যদি সামরিক ব্যানারে বা সামরিক আইনে কোনো অপরাধ হয় তাহলে সে অপরাধের বিচার সামরিক আদালতে করতে পারবে। কিন্তু যদি সাধারণ অপরাধ যেগুলোা হয়েছে সে-অপরাধের বিচার সংবিধানের অধীনে যে-সমস্ত আদালত আছে, সেই আদালত দেখবে। স্পেশালি যে কেসটা এল, সেটা হচ্ছে বাজিতপুর মার্ডার কেস। এটা যখন হলো, সুপ্রিম কোর্টে যখন আপিল এল, তখন আমার বক্তব্য ছিল যে এই ঘটনাটা ঘটেছে '৭৪ সালে এবং '৭৪ সালে পুলিশ এনকোয়ারি করে ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে পার্টি, ঐ বিরোধী যারা ছিল, বাদিপক্ষ যারা ছিল, ঐ যারা মারা গিয়েছে তাদের আত্মীয়স্বজন কোর্টে কেস করেছে,

সেই কোর্টের কেসে তারা হেরেছে। তারপর হঠাৎ করে দু'বছর আড়াই বছর পরে ওটা আবার কেসটাকে revive করল। কেসটা করে সাতদিনের মধ্যে পুলিশ চার্জশিট দিয়ে দিল। চার্জশিট দেওয়ার পরে যখন ট্রায়াল হচ্ছে সেশন কোর্টে তখন মার্শাল ল' কেস withdraw করে নিল। মার্শাল কোর্টেতে ট্রায়াল হচ্ছে, তো তার বিরুদ্ধে এরা সুপ্রিম কোর্টে এল। তো তখন আমার বক্তব্য ছিল যে সাধারণ আইনে ঘটনাটা হয়েছে, পুলিশ এটা এনকোয়ারি করে রিপোর্ট দিয়েছে এবং তারপর যদি সেশন কোর্টে ট্রায়াল হয়, দায়রা জজের সামনে ট্রায়াল হলে, দায়রা জজ তখন বিচার করবে কেসটা। কারণ সামরিক আইনের অধীনে কোনো অপরাধ হয় নাই। আমি একা ছাড়া বাকি চারজন জজ বললেন, না ওটা ঠিকই হয়েছে। এরকম আরো বিভিন্ন ধরনের চারটে কেস ছিল। এবং সবকটারই একই কথা ছিল যে মার্শাল ল' যদি থাকে তাহলে মার্শাল ল' সুপিরিয়ার না কন্সটিটিউশন সুপিরিয়র ? আমার বক্তব্য ছিল যে যদি conflict-এ না আসে, মার্শাল ল'র সঙ্গে যদি কন্সটিটিউশনের কোনো conflict না হয় তাহলে কন্সিটিটিউশন সুপিরিয়ার। তার ফলে আশি সালে আমাকে অ্যাম্বাসেডর করে সুপ্রিম কোর্ট থেকে বিদায় দেওয়া হয়। তারপর বিরাশি সালে ('৮২তে জেনারেল এরশাদ মার্শাল ল'র মাধ্যমে ক্ষমতায়) মার্শাল ল' যখন হয় তখন আমাকে ফেরত আনা হলো। ফিরিয়ে আনার ষোলোদিন পর আমাকে বলল যে তোমাকে সামরিক আইনের বদৌলতে রিমুভ করা হলো।

এ.এস.এম.মহসীন বুলবুলের সাক্ষাৎকার

প্রাক্তন সেক্রেটারি, রায়েরবাজার আওয়ামী লীগ, ঢাকা

স্থান : ৭৫১ সাতসমজিদ রোড, ধানমন্ডি (তাজউদ্দীন আহমদের বাসভবন)

সময় : সকাল ৯-৩০ ... ৮ জুলাই ১৯৮৭, সঙ্গে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন

ট্রান্সক্রাইব : মনসুর আলী

শারমিন আহমদ : আমি আপনার কাছে যেটা জানতে চাইছি— আপনি তো জেলের মধ্যে ছিলেন তাই না ? আপনি কি সামাদ সাহেবদের সাথে থাকতেন ? না কি ...

মহসীন বুলবুল : আমি কামরুজ্জামান সাহেবদের সঙ্গে একরুমে ছিলাম।

শারমিন আহমদ : সেই সময় জেলে আপনি কতদিন ছিলেন ?

মহসীন বুলবুল : আমি ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার পরপরই অ্যারেস্টেড ছিলাম। তারপর ক্যান্টনমেন্টে, তারপরই জেলে। মোহম্মদপুর থানায় আমাকে ৯দিন রাখল, মহম্মদপুর থানায় যতরকম টর্চার আছে – তারপরই জেলে। যে রাত্রিতে ঘটনা ঘটল তখন কামরুজ্জামান সাহেব ও আমি একসাথে ছিলাম। কামরুজ্জামান সাহেব সেইদিন কিন্তু কুরআন শরিফ পড়তেছিলেন। যখন ওরা কামরুজ্জামান সাহেবকে ডাকল তখন বেচারা [কামরুজ্জামান সাহেব] কাঁদতেছিলেন এমনভাবে যে পাঞ্জাবিটা হাতে দেওয়ার পর পাঞ্জাবিটা হাত থেকে পড়ে গেল। উনি তখনই কেঁদে ফেললেন। কামরুজ্জামান সাহেব কেঁদে ফেললেন। ওখান থেকে নিয়ে তাজউদ্দীন ভাইয়ের রুমে নিয়ে গেল। তাজউদ্দীন সাহেবের রুমে আবার থাকতেন কোরবান আলী সাহেব, আর তাজউদ্দীন ভাই [আরো অনেকে]... ! কামরুজ্জামান ভাইকে বের করে কোথায় নিল আমরা তা দেখিনি। ... তারপর তো রাত্রে যখন গুলিটুলি হলো তখন তো আর্তনাদ আর চিৎকার ! জীবনের প্রতি ... (অস্পষ্ট)

শারমিন আহমদ : আপনি কামরুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন তখন ওনাকে নিতে কারা আসে ?

মহসীন বুলবুল : অনেক লোক, সিভিল ড্রেসে ছিল। অনেক আর্মি ছিল। কাঁধে এয়ার ব্যাগ ছিল। কামরুজ্জামান সাহেবকে যখন ডাকলেন ...

শারমিন আহমদ : একজন এসে ডাকলেন ?

মহসীন বুলবুল : একজন না চারজন, খুব অশ্লীল ভাষায়।

শারমিন আহমদ : কীভাবে ডাকল ?

মহসীন বুলবুল : "এই বের হও" বলে। একজনের হাতে একটা কাগজ ছিল, লিস্ট ছিল। আর জেলখানার একজন লোক। সেই কিন্তু কে কোন্ রুমে আছে (দেখিয়ে দেয়), মনে হয় সুবেদার। কামরুজ্জামান সাহেব তখন কিন্তু কুরআন শরিফ পড়তেছিলেন। ঐ চিৎকারে যেভাবে ডাকল সে-ভল্যুমে তাতে তো আতঙ্কিত হবারই কথা। তখনই মনে করলাম একটা কিছু হতে যাচ্ছে। কামরুজ্জামান সাহেব কুরআন শরিফ বন্ধ করে আমাকে বললেন "বুলবুল, পাঞ্জাবিটা দাও।" পাঞ্জাবিটা দিলাম। উনি লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরা ছিলেন। তারপরই তো পাঞ্জাবিটা পড়ে যায়। উঠানোর শক্তিও হলো না উনি এমন ভয় পেয়েছিলেন। তারপরই তো আমার মনে হলো ... আমি তো আতঙ্কিত, সবাই আতঙ্কিত। এমন ভয়ভীতি হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুলি হলো। দুই তিন মিনিটের মধ্যে। বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করলাম। ঐ চিৎকার মনে হয় আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এতজোর চিৎকার। জীবনের যে কী মায়া ! আমরা যুদ্ধ করলাম ৯ মাস – ১০ মাস, এত আতঙ্কিত হইনি। তারপরে কে মরল কী করল কিছুই তো বুঝতে পারলাম না। অনুমান করছি একটা কিছু হয়েছে। মেরে ফেলেছে। কিন্তু কে মরল তা তো জানি না। ৪দিন কমপ্লিটলি লকট আপ। আর কোনো একটা সিপাই জেলের মিয়াসাব বা জেলার তারা কোনো সংবাদই বলে না। ওদেরকে জিজ্ঞেস করলে কোনো একটা শব্দ নাই। কী হয়েছে কিছু বলে না। চারদিন লক আপ খোলে নাই। এখন সেইখানে ল্যাট্রিন সেটাও পরিষ্কার করছে না। গোসল টোসল তো বাদই দিলাম।

শারমিন আহমদ : দোসরা নভেম্বর দিবাগত রাত ৩ নভেম্বর থেকে কতদিন পর্যন্ত লক আপে ছিলেন ?

মহসীন বুলবুল : 8 দিন। Four days completely. We were in confinement. We couldn't go outside.

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : কারো কোনো গলার সাউন্ডও শুনলেন না ?

মহসীন বুলবুল : না, কারো কোনো গলার সাউন্ড শুনিনি।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : গুলির সাথে সাথে মারা গিয়েছে ?

মহসীন বুলবুল : তাজউদ্দীন সাহেবের কথা, যেটা আমরা পরে শুনলাম। ডেডবডি সব বের করে নিয়ে আসার পরে যেটা জানতে পারলাম অমুক অমুক মারা গিয়েছে। আগে তো কিছুই জানতে পারিনি। We haven't seen

anybody. তাজউদ্দীন সাহেব অনেকক্ষণ জীবিত ছিলেন, more than an hour

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : ওনার কোনো vital জায়গায় গুলি লাগেনি ... ব্লিডিং হয়ে ...

মহসীন বুলবুল : ওনার নাকি একটা গুলি লেগেছিল পায়ে না কোথায় ... দুটো গুলি লেগেছিল। [প্রত্যক্ষদর্শীদের মারফত, মোট তিনটি গুলিবিদ্ধ হবার কথা জানা যায়]

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : পায়ের এপাশ দিয়ে গুলি যেয়ে ওপাশ দিয়ে ... ব্লিডিং হয়ে ...

মহসীন বুলবুল : উনি অনেকক্ষণ এই অবস্থায় ছিলেন। উনি শুধু ব্লিডিংয়ে মারা গেছেন।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : হসপিটালে নিলে হয়তো বাঁচানো যেত।

মহসীন বুলবুল : হসপিটাল মানে, তখন যে কোনো ডাক্তারও যদি আসত। দুই ঘণ্টা বা চার ঘণ্টা পরেও কোনো ডাক্তার আসলেও উনি তখন বাঁচতেন।

শারমিন আহমদ : কে বলেছিল আপনাকে এ কথাটা ?

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : তাজউদ্দীন ... ইশ্‌শ ...

মহসীন বুলবুল : এটা বলেছে এক ডাক্তার, ওখানে ছিলেন। হুদা বলে একজন ডাক্তার। বরিশালে বাড়ি।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আহা ... ওরা বলেছিল ... পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে তো এটা আছে যে ব্লিডিং হয়ে মারা গিয়েছে।

মহসীন বুলবুল : Completely bleeding-এ উনি মারা গিয়েছেন।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : গুলির দাগটা এখনও বলে আছে।

মহসীন বুলবুল : ওনার গুলির দাগটা তো আছে। নেয়ামুল কুরআন ছিল তাজউদ্দীন ভাইয়ের। সেটা (হত্যাকাণ্ডের পর) stayed with কোরবান আলী। পরে আমরা একসঙ্গে জেলের হসপিটালে ছিলাম।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আর ডায়েরির কথা ?

মহসীন বুলবুল : আর একটা সুন্দর ডায়েরি ছিল। গোল্ডেন ব্যান্ডের। [সোনালি বর্ডার দেওয়া কালোমলাটের ডায়েরি] আমরা দেখেছি। উনি সকালেও ডায়েরি লিখেছেন। তাজউদ্দীন ভাইয়ের একটা অভ্যাস ছিল উনি সকালে উঠে exercise করতেন। নামাজ পড়ে, exercise করে, হাঁটাহাঁটি করে তারপর উনি নাশতা করতেন। তারপর নাশতা করে উনি সুন্দরভাবে ডায়েরি লিখতেন। ওনার ডায়েরিটা ছিল very important ডায়েরি। একদিন আমি কৌতূহলবশত ওনাকে বলতে উনি বললেন "তুমি খালি খাও। একটু

দৌড়াদৌড়ি জগিংটগিং করো।" আমি বললাম, "তাজউদ্দীন ভাই, কালকে থেকে করব।" তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, "হ্যাঁ, তোমার কালকে আর শেষ হবে না।" আমি বললাম, "তাজউদ্দীন ভাই কি এত ডায়েরি লেখেন প্রত্যেকদিন ?" উনি বললেন, "লিখি। লিখে রেখে যাই। বাংলাদেশ চলবে, কী করে চলবে তার একটা কিছু থাকতে হবে তো।" তারপরে উনি ঐ ডায়েরিতে প্রত্যেকদিন বাংলাদেশ সম্বন্ধে লিখে রাখতেন। বাংলাদেশের economy'র উপরে ওনার এত সুন্দর guideline ছিল যা চিন্তা করার বাইরে।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আহ্ হা, কী valuable কথা ! উনি বললেন, বাংলাদেশ চলবে, কীভাবে চলবে, এটা লিখে রেখে যাই ?

মহসীন বুলবুল : হ্যাঁ। (তাজউদ্দীন আহমদের উদ্বৃতি) "এটা লিখে রেখে যাই। এটা তো কেউ চিন্তা করবে না। এখন প্রচুর সময় হাতে।" বাংলাদেশের ইকনমির ... আর এই বাংলাদেশে কী কী হবে, স্কুল সম্পর্কে, ক্লাস এইট বা টেন পর্যন্ত এডুকেশন ফ্রি হবে, তারপর কম্পালসারি মিলিটারি ট্রেনিং যেটা EOTC ছিল, তাদেরকে সেই মিলিটারি ট্রেনিং দেওয়া হবে।

শারমিন আহমদ : এটা কি আপনি ডায়েরি থেকে কিছু কিছু দেখতে পেরেছিলেন ?

মহসীন বুলবুল : হ্যাঁ, আমি ডায়েরি থেকে কিছু কিছু ...

শারমিন আহমদ : কখন দেখেছিলেন ডায়েরি থেকে ?

মহসীন বুলবুল : হ্যাঁ, মাঝে মাঝে তো ওনার ডায়েরি দেখতাম। উনি লিখতেন। ইকনমির উপর লিখতেন। আমরা অনেক সময় গেলে ডিস্টার্ব হতো। উনি বলতেন, "ডিস্টার্ব কোরো না, একটু লিখতে দাও।" আমরা ওনার কাছে অনেক কিছু জানতে চাইতাম। এটা আমাদের কৌতূহল ছিল। উনি অনেক কিছু জানেন। ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানার আমাদের কৌতূহল ছিল। তিনি আওয়ামী লীগের গভর্নরশিপের [বাকশালাধীন প্রশাসনের অঙ্গ] চরম বিরোধী ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন ['৭৫-এ বাকশাল গঠনের পর] "বঙ্গবন্ধু আমাকে বলছেন ঢাকার গভর্নর করবেন। শোনো, আওয়ামী লীগ যখন করেছ কচুকাটা এমনি হবে। কী যে অবস্থা হবে চিন্তা করতে পারছ না ? যদি এই গভর্নরশিপ হয় তাহলে বোঝ যে কী অবস্থা হবে। আমি বাইরে আছি, আমাকে বের করে দিয়েছে, আমার মন্ত্রিত্ব চলে গিয়েছে—আমি বাঁচবো তা-ও-না। কিন্তু এই গভর্নরশিপের সাথে একদম কচুকাটা হবে। আর যদি তুমি কোনো অবস্থায় বাদ পড়তে পারো আর যদি কোনো অবস্থায় নামটা কাটাতে পারো, তাহলে দুই রাকাত শোকরানা নামাজ পড়।"

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আরে বাপরে, কী দূরদৃষ্টি !

মহসীন বুলবুল : ভাবি, আমি এখন পর্যন্ত যার কাছে যাই একই কথা বলি।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন নাম কাটাতে বলেছিলেন ? কেন কচুকাটা করবে ?

মহসীন বুলবুল : ঐ যে ভুলভাবে পরিচালিত হচ্ছে ! [উনি বলতেন] "আজকে বঙ্গবন্ধু শুধু একটু শুনতে চাচ্ছেন না, কারা তাঁর পাশে থেকে কারা তাঁর কানটা বিষিয়ে তুলছে।" উনি ওনার কতগুলো স্মৃতিচারণ করলেন। "আমি স্কলারশিপের টাকা পেতাম। আমার স্কলারশিপের টাকার পয়সা দিয়ে কাগজ কিনে রিসিট বই ছাপিয়েছি। তাহলে কী দুরবস্থা ছিল। শোনো, সেইকালে আমার স্কলারশিপের টাকা দিয়ে কাগজ কিনে রিসিট বই ছাপিয়ে আওয়ামী লীগের চাঁদা তোলা হয়েছে।"

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : এখন সেই আওয়ামী লীগ (কোথায় ?) ...

শারমিন আহমদ : ওনার টাকায় রিসিট বই ছাপিয়ে চাঁদা তুলতেন ?

মহসীন বুলবুল : হ্যাঁ, ওনার সেই স্কলারশিপের টাকায় ...

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : কী valuable কথা ...

মহসীন বুলবুল : তাজউদ্দীন ভাই নিজে আমাকে সে-কথা বলেছেন। বলেছেন "বঙ্গবন্ধু ছিলেন 'মুজিব ভাই'। আর ৪/৫ জন ছিল। আমরা নিজেরা পাক করতাম। এখন শুধু ভাত যে পাক করার আছে, আর তো কিছু নাই। এখন ঐ বাড়িতে [প্রতিবেশীর] গিয়ে বলতাম, আমাদের তরকারির জন্য একটু লবণ [লাগবে] আর লবণ তো কোনো ব্যাপার ছিল না। আর এক বাসায় গিয়ে বলতাম, পেঁয়াজ তো নাই, তরকারি পাক করব কী দিয়ে ? কারণ নিজের মানসম্মান তো বজায় রাখতে হয় ! সেইভাবে আমরা মরিচ ভেঙে, লবণ দিয়ে, তেল দিয়ে ভাত খেয়ে এই আওয়ামী লীগ করেছি। আর আজকে সেই আওয়ামী লীগ থেকে আমি দূরে !"

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : এইভাবে আওয়ামী লীগ ...

মহসীন বুলবুল : [তাজউদ্দীন আহমদের উদ্ধৃতি দিয়ে] "এইভাবে আওয়ামী লীগ করেছি, সেই আওয়ামী লীগ আজকে আমাকে কেন অবিশ্বাস করছে, আমি সেটাই বুঝতে পারছি না। কারণটা কী ? আজকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে লাভটা কী ? দেশের আজকে কতবড় ... ঠিক আছে, আমি থাকলাম না। কিন্তু আমাকে তো শুনতে হবে। জানতে হবে।" আর একটা কথা। উনি রক্ষীবাহিনীর উপর একটা কথা বলেছিলেন। "ইন্ডিয়ান আর্মি রক্ষীবাহিনীকে ট্রেনিংয়ের জন্য এসেছে এয়ারপোর্টে, অথচ আমি জানি না। আমি হলাম ফাইনান্স মিনিস্টার। আমার কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স লাগবে।

কোথায় ট্রেনিং হবে আমাকে তো জানতে হবে। আমার কাস্টমসরা ধরল যে তাদেরকে ক্লিয়ারেন্স দেয়া হবে না।"

শারমিন আহমদ : রক্ষীবাহিনী ট্রেনিংয়ে গেল ?

মহসীন বুলবুল : ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়ান আর্মি, তারা রক্ষীবাহিনীকে ট্রেনিং দেয়ার জন্য ঐখান থেকে এসেছে। স্কলারশিপ, এটা স্কলারশিপ দিয়ে আনতে হয়। কিন্তু তাজউদ্দীন ভাই এটা as a Finance Minister কিছু জানেন না। কিন্তু এয়ারপোর্টে যখন তাদেরকে আটকিয়েছে ক্লিয়ারেন্সের জন্য, তখন তো respective Ministry-র কাছে আসতে হবে। ফাইনান্স মিনিস্ট্রি থেকে ক্লিয়ারেন্স নিতে হবে। যখন ঐখানে গেছে তো উনি কিছু জানেন না। তখন [তাজউদ্দীন আহমদ] বললেন, "তাহলে আমার ফাইনান্স মিনিস্টার থাকার অর্থ কী ? কারণ সবকিছু আমাকে ডিঙিয়ে করা হয়েছে। আমি Finance Minister আমি জানব না ? আমার এখান থেকে (clearance) আনবে আমাকে ডিঙিয়ে, যেহেতু আমি অর্ডার দিই নাই। কাজেই আমার তো সেখানে কিছুই রইল না।" (সাক্ষাৎকারদাতার বরাত দিয়ে তাজউদ্দীন আহমদের উক্তি) ওনাকে এইভাবে একের পর এক কর্নার করেছে।

শারমিন আহমদ : রক্ষীবাহিনীর ট্রেনিং ১৯৭২-এ হলো ?

মহসীন বুলবুল : হ্যাঁ, ৭২-এ হলো। তাজউদ্দীন ভাইয়ের এই কথাবার্তাগুলো উনি যা যা বলেছেন।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : যা যা বলে গেছে তাই তো হয়েছে !

মহসীন বুলবুল : Exactly. ভাবি এর মধ্যে কোনো ইয়ে নেই। এগুলো হয়তো আপনার মনে থাকবে, ঐ রক্ষীবাহিনীর কথাগুলো। উনি বলেছেন ওনার ছাত্রজীবনের কথা। পয়সা তো নেই। চাঁদা দেয় না কেউ। দেখলেও মানুষ হেয় করে। সেইখানে উনার স্টাইপেন্ডের টাকা দিয়ে উনি আওয়ামী লীগ করেছেন।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আহ হা, কী dedicated মানুষ ছিলেন তিনি।

মহসীন বুলবুল : ওনার জীবনটাই তো সব দিয়ে গেলেন। এরপরেও উনি জেলখানায় বসেও বাংলাদেশ কীভাবে চলবে সেধরনের চিন্তা, বাংলাদেশের economy'র উপরে উনি লিখেছেন এত সুন্দর। কী স্বচ্ছ উনার চিন্তা।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আর foreign policy'র উপরে ?

মহসীন বুলবুল : Foreign policy'র উপরে মারাত্মক স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। উনি বলেছেন অ্যাম্বাসিগুলো simply wastage. Irregular হচ্ছে। ওখানে শুধু শানশওকত করে নিজেকে সাজানো। বাংলাদেশের পণ্যর কী হলো

না-হলো, কোন্ ছেলের চাকরি হলো কিনা—এসব কিছুই করা হচ্ছে না। শুধু তারা সাজগোজ করে যতরকমের টাকা নষ্ট করছে।

শারমিন আহমদ : অ্যাম্বাসির বিকল্প কোনোকিছু কি বলেছেন ?

মহসীন বুলবুল : সেগুলো ওনার ডায়েরির মধ্যে লিখেছেন। উনি এগুলো আমাদের বলতেন।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : অ্যাম্বাসির সেটিং-এর পদ্ধতিটা ভুল হওয়াতেই ওরা ঐ সুযোগগুলো পায়। (তাজউদ্দীন আহমদ স্ত্রীর কাছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশে ট্রেড কমিশন স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছিলেন)।

শারমিন আহমদ : আচ্ছা এই ডায়েরিটা আপনি শেষ কবে দেখেছেন ?

মহসীন বুলবুল : ডায়েরিটা শেষ দেখেছিলাম 13th March, Saturday, 1976. I exactly remember. জেল থেকে রিলিজের সময়।

শারমিন আহমদ : কার কাছে ছিল ?

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : কার কাছে ঐ ডায়েরিটা ছিল ?

মহসীন বুলবুল : কোরবান আলী সাহেবের কাছে। আমি কোরবান আলী সাহেবকে বললাম, "ডায়েরিটা দেন, ভাবিকে দিই। নেয়ামুল কুরআনটা [তাজউদ্দীন আহমদের] ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। ওটাও কোরবান আলী দেননি। সাবানের ভেতরেও বুলেট ঢুকে ছিল।

শারমিন আহমদ : কোরবান আলী সাহেব জেল থেকে ডায়েরিটা নিয়ে গিয়েছিলেন। অথচ উনি তা অস্বীকার করেন। আপনি তো প্রত্যক্ষদর্শী, আপনি কি পারেন না ...

মহসীন বুলবুল : আমি তো উনাকে বারবার বলেছি।

শারমিন আহমদ : এটা তো valuable asset ...

মহসীন বুলবুল : অনেক সাধাসাধি করেছি। আমার অনেক কলিগের কাছে বলেছি কোরবান আলী কোনো একদিন কোরবান আলীর নাম দিয়ে বাংলাদেশে ছাপাবেন।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : আচ্ছা উনি মারা যাওয়ার পর ডায়েরিটা পড়ার কি সুযোগ হয়েছিল ?

মহসীন বুলবুল : না, ঐটা যে কোরবান আলী সাহেবের কাছে ছিল।

শারমিন আহমদ : উনি দেখতে দিতেন না ?

মহসীন বুলবুল : না, উনি পড়তেন। চাইলে উনি বলতেন "কী দরকার—এটা ব্যক্তিগত।"

শারমিন আহমদ : তাহলে আপনি [কোরবান আলীকে উদ্দেশ্য করে] পড়েন কী করে ...

মহসীন বুলবুল : (হেসে) সেইটাই তো কথা ...

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : পরের দিকে আপনি জেল থেকে বের হবার সময় ...

মহসীন বুলবুল : আমি বললাম যে কোরবান আলী ভাই ডায়েরিটা দেন, ভাবির কাছে পৌঁছে দেব। উনি বললেন, "বুলবুল তোমার কাছে ডায়েরি দেখলে জেলের গেটে তোমাকে ধরে আবার ঢুকিয়ে দেবে SB [Special Branch]'র লোকরা।" নেয়ামুল কুরআনটা পর্যন্তও দেননি। আমি বলেছিলাম, ভাবিকে অন্তত একটা জিনিস দিই যেন ভাবি দেখেন এটা তাজউদ্দীন সাহেবের স্মৃতি।"

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : উনি এগুলো নিয়েছেন ভবিষ্যতে গেম খেলার জন্য ...

মহসীন বুলবুল : নেয়ামুল কুরআনটা গুলিতে একদম ঝাঁঝরা ছিল।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : ইশ্‌শ্‌ ...

শারমিন আহমদ : আর সাবানদানির ভেতরে গুলি ছিল।

মহসীন বুলবুল : হ্যাঁ, সাবানের মধ্যে গুলি ছিল।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : মুক্তির পর কোরবান আলী সাহেবের সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়নি ?

মহসীন বুলবুল : কোরবান আলী সাহেবের সাথে একদিন দেখা হয়েছিল। আমি বললাম "কোরবান আলী ভাই তাজউদ্দীন ভাইয়ের ডায়েরিটা তো আপনি নিয়েছেন। আমি তো জানতাম তাজউদ্দীন ভাই লিখতেন। উনি তো মাঝে মাঝে বলতেন। উনি বললেন, হ্যাঁ, কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটা লিখেছিল কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কে নিলো [ডায়েরিটা] আমি তো মনে করতে পারছি না।" আমি বললাম, আমি তো ভাবিকে এখবর জানিয়েছিলাম যে ডায়েরিটা আপনার কাছে ... এবং সোনালি বর্ডারটা ছিল। আপনার কাছে ছিল।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : ডায়েরির মলাটটা কি কালারের ছিল ?

শারমিন আহমদ : কালোর মধ্যে গোল্ডেন ?

মহসীন বুলবুল : হ্যাঁ, কালোর মধ্যে চতুর্দিকে গোল্ডেন — beautiful diary.

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : উনিও একথা বলেছিলেন — আমি ১ তারিখে [১ নভেম্বর, ১৯৭৫, জেলে শেষ সাক্ষাতের দিন] দেখা করতে গেলাম, উনি বললেন, "আজকে রাতে আমার ডায়েরিটা লেখা শেষ হবে।"

শারমিন আহমদ : তখন যদি আপনার হাতে দিয়ে দিত ...

মহসীন বুলবুল : ওটা টাফ একটা টাইম। অসম্ভব ...

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : কেমন করে দেবে। দেওয়ার উপায় কি ছিল ? ওনার আশেপাশে মিলিটারির লোক জেলখানা ঘিরে রেখেছে, ওরা কি ডায়েরিটা দিতে দেবে ?

শারমিন আহমদ : আজকে বহুল মুখে প্রচারিত অনেকেই জানে কোরবান আলী সাহেবের কাছে ডায়েরিটা আছে। উনি যদি ভবিষ্যতে কোনো বই [ডায়েরিকে নিজের নামে ব্যবহার করে বই প্রকাশ করেন] বের করেন তাহলে লোকে কি মনে করবে এটা তার লেখা ? সেটা কি তার মতো ক্যালিবারের লোক ...

মহসীন বুলবুল : এখন ব্যাপার হয়েছে, আমাদের মতো প্রত্যক্ষদর্শী লোক আওয়ামী লীগে ছিলাম, eye witness, আমরা যদি মরে যাই হয়তো বলবে কারণ আমরা তো [বেঁচে থাকলে] প্রোটেস্ট করব।

শারমিন আহমদ : এটা [ডায়েরি] কি কোনোমতে কোরবান আলী সাহেবের কাছ থেকে নেওয়া যায় না ? আজকে বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক নেতার কোনো লেখনি নেই। কী দেখে আমরা গাইডলাইন নেব ? মাও-এর বই দেখে তো রেভ্যুলুশন হয়েছে। চেগুয়েভারার বই (চেগুয়েভারার ডায়েরি থেকে বই রচিত ও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে) তো ঘরে ঘরে লোকে পড়ছে। আমাদের কী আছে ? এই ডায়েরিটা উনি কেন দেন না ? এটা নিয়ে কি একটা কমিটি করা যায় না ? আপনাদের চেয়ারপার্সনকে বলেন যেন ডায়েরিটা উদ্ধারের ব্যবস্থা আমরা নিই।

মহসীন বুলবুল : আমাদের আওয়ামী লীগের চরিত্র সম্বন্ধে বলছি। আজকে যেখানে আমি মনে করব উনি আমার চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং তখন লোকটাকে কর্নার করার জন্য সবসময় চেষ্টা করব। আমি একজন talented লোককে কখনো স্থান দেব না। This is the character of Awami League. আমি একজন talented লোককে কখনো স্থান দেব না। এই যেমন তাজউদ্দীন ভাইয়ের মতো বলিষ্ঠ সাহসী লোক — I never met anybody like him in my 26 years in politics. আমি ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতি করি।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : সে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেল। রক্ষা করে যেতে পারল না।

মহসীন বুলবুল : উনি একটা এতবড় ইতিহাস করলেন ! উনি বলতেন education policy-তে ক্লাস টেন পর্যন্ত ফ্রি করে দেওয়া হবে। তারপর compulsory মিলিটারি ট্রেনিং থাকবে। আমাদের মিলিটারি উইং থাকবে। কারো সাথে আমাদের যুদ্ধ দ্বন্দ্ব নেই, সবার সাথে বন্ধুত্ব। ওনার তো ঐ ধারার চিন্তাধারা ছিল।

মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী চার নেতা; তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম. মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামান।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : Straight-cut policy.

মহসীন বুলবুল : Straight-cut policy. ওনার একটা স্বভাব ছিল যেটা ত্য সেটা যেই হোক না-কেন বলতেন। উনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি বঙ্গবন্ধুকে লতেন। আমরা যে ওনার কর্মী ছিলাম। ওনার নির্দেশে আমরা যা কিছু করি, নি কোনো destructive policy দিতেন না। Always constructive, পার্টি ীভাবে সুন্দর হবে, সেটা সেইভাবে বলতেন। উনি বলতেন, "এটা তো একটা াজনৈতিক দল, লাঠিয়াল বাহিনী নয়।" ১৯৭০-এ যখন নমিনেশন দেবার থা হলো, আমি বাসায় আসলাম। বললাম, "তাজউদ্দীন ভাই, নাসরুল্লাহ াকি নমিনেশন চাইবে।"উনি বললেন, "তুমি চাচ্ছ না ?" আমি বললাম, তাজউদ্দীন ভাই, নাসরুল্লাহ চাইলে তো আমার কোনো প্রশ্নই আসে না।" নি বললেন, "নাসরুল্লাহ উপযুক্ত হলো ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পর্যন্ত। সে াবার নমিনেশন কীভাবে চায় ? সে পার্লামেন্ট শব্দ কি উচ্চারণ করতে পারে ? ইসব চলবে না।"

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : ঠিকই তো বলেছেন।

মহসীন বুলবুল : উনি সেই ধরনের লোক ছিলেন। বঙ্গবন্ধু পরে ডঃ মোশারফকে (নমিনেশন) দেন। এরকম একজন (তাজউদ্দীন আহমদ) দূরদর্শী লোক আওয়ামী লীগে যদি দ্বিতীয় একটা থাকত আমি গর্ব করে বলতে পারি, হলফ করে বলতে পারি, তাহলে আজকে আমাদের এই দুরবস্থা হয় না। এত foresightedness ছিল ! তার প্রমাণ এই গভর্নরশিপ। ঢাকার গভর্নর আমাকে যখন তারা করতে চেয়েছিল, একেবারে এই বাসায় বসে বললেন, "তুমি যদি সেখান থেকে বাদ পড়তে পারো, নামটা কাটাতে পারো. তখন দুই রাকাত শোকরানা নামাজ পড়ো।"

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন : তার রক্ত-মজ্জার ভেতরে ছিল রাজনীতি এবং অদূর ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে সেটা ছিল।

শারমিন আহমদ : আপনার ঢাকার গভর্নর হবার কথা ছিল ?

মহসীন বুলবুল : হ্যাঁ। I was the single candidate of the constitutency. তখন মীরপুর ও মোহম্মদপুর (নির্বাচনকেন্দ্র) ছিল। তখন আমি একমাত্র ব্যক্তি ছিলাম। তখন একটাই নমিনেশন ছিল। তখন দুজনে একসঙ্গে বসে ঠিক করা হয়েছিল যে একটা বুলবুলকে দেওয়া হবে। আনওয়ার চৌধুরী তখন দপ্তর সম্পাদক, জিল্লুর রহমান জেনারেল সেক্রেটারি। (উনি বললেন) "ঠিক আছে আমি তোকে ঢাকার গভর্নর করব। জাতীয় স্বার্থে তুই কামাল হোসেনের জন্য সিট ছেড়ে দে।"

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন: ওহ্ এটা বলেছিলেন ?

শারমিন আহমদ : কী বললেন কথাটা ?

মহসীন বুলবুল : বঙ্গবন্ধু বললেন যে, এখানে আমি তো একমাত্র ব্যক্তি। দ্বিতীয়টায় তো নমিনেশনই হয়নি। আমাদের দুই থানার লোক আওয়ামী লীগের কর্মকর্তারা বসে ঠিক করল যে গতবার তোমরা মীরপুর থানা থেকে নমিনেশন নিয়েছ এবার আমরা মোহম্মদপুর থানা থেকে নমিনেশন দেব। এখান থেকে দিলে তো আমি একমাত্র ক্যান্ডিডেট। আমি একমাত্র ব্যক্তি এবং নমিনেশন পেপারও সাবমিট করা হয়েছিল। আর দ্বিতীয় তো নাই–আমি অটোমেটিক্যালি পাচ্ছি। তখন বঙ্গবন্ধু দেখলেন যে এটাতে আওয়ামী লীগের বড় বিপদ। তখন ড. কামাল হোসেন ছিলেন তেজগাঁ পশ্চিম থেকে নির্বাচিত। তখন এই কারণে উনি ড. কামাল হোসেনকে আমার জায়গা দিয়ে বললেন, 'তুই জাতীয় স্বার্থে সিটটা ছেড়ে দে। তোকে আমি ঢাকার গভর্নর বানাব।' তখনো জানতাম না যে গভর্নরটা কী–কীভাবে হবে।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন: কী সব ইতিহাস...

মহসীন বুলবুল: ইতিহাস...

শারমিন আহমদ : আপনার কি মনে হয় কোরবান আলী ডায়েরিটা Destroy করে দেবে ?

মহসীন বুলবুল : Destroy করার মতো ঐ ডায়েরি সেটা না।

শারমিন আহমদ : সেটার মধ্যে তো গঠনমূলক পলিসিই ছিল।

মহসীন বুলবুল : সম্পূর্ণ গঠনমূলক পলিসি। ঐটা যদি এরশাদের [কোরবান আলী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে জেনারেল এরশাদের দলে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হন] কাছে কিছুটা বিক্রি করে থাকে। তাহলে এরশাদকে সেভাবে পরিচালিত করতে উৎসাহিত করেছে। আমার মনে সন্দেহ আছে। আমি তাজউদ্দীন ভাইয়ের কিছু পলিসি সাসপেক্ট করছি।

শারমিন আহমদ : কী ধরনের পলিসি ?

মহসীন বুলবুল : আজকে এতটা আনপপুলার গভর্মেন্ট আর কোনো দেশে আছে কিনা জানি না। অথচ তিনি দেশটা কীভাবে পরিচালিত করছেন। আওয়ামী লীগের যে সব কর্মকাণ্ড আমাদের কর্মকাণ্ড যেগুলো, সেগুলোই জাতীয় পর্যায়ে তিনি [জেনারেল এরশাদ] করছেন। তার মানে, এগুলো সম্পূর্ণ তাজউদ্দীন ভাইয়ের পলিসি। সেগুলো সেখানে বিক্রি করা হচ্ছে। আমি তো মনে করি তাজউদ্দীন ভাইয়ের পলিসিগুলো বিক্রি করেছে। নতুবা কোরবান আলী একেবারে সহসা সেখানে কী করে ঢুকে পড়ল। এগুলোর একমাত্র কারণ মনে হয় তাজউদ্দীন ভাইয়ের সুন্দর পলিসি। ওই যে স্কুল টিস্কুল যেগুলো করছে সব ওসব পলিসিতে করা। কী সুন্দর Power of Decentralization... সেটা তো আমাদেরই পলিসি।

শারমিন আহমদ : উপজেলা ব্যাপারটা তো সম্পূর্ণ আওয়ামী লীগেরই গড়া।

জেলহত্যার ওপর টেলিফোনে ছোট সাক্ষাৎকার

হোসনে আরা

মফিউদ্দীন আহমদের স্ত্রী, আমার মেজ কাকি

আমরা সে সময় তোমার মফিজ কাকুসহ ১৯ নং রোডে মধুবাজারে থাকতাম। ৩ নভেম্বর সকালে হঠাৎ রেডিও বন্ধ হয়ে যায়। তোমার মফিজ কাকু বাবুলকে পাঠালেন তোমাদের বাসায় খবর আনতে। মাথার ওপর তখন জঙ্গি বিমান ঘোরে। বাবুল যেয়ে বলে, 'মামানি , অবস্থা ভালো না'। তোমার আম্মা বাবুলকে বললেন কী মারাত্মক স্বপ্ন দেখলাম ! মধ্যগগনের সূর্য রক্তের মতো লাল আলো তোমার মামার গায়ে ফেলছে।'

রিপি : আম্মা এই কথা বাবুলকে বলেছিল ?

কাকি : হ্যাঁ, বলেছিল। আমার ভাই মেজর আতাউর রহমান ৪ তারিখে জেলগেটে ডিউটিতে ছিল। সে ষোলো জন বিডিআর-এর পুলিশ দিয়ে দেয়, যাতে ভাই সাহেবের লাশ চুরি না হয়। মনসুর আলী ও নজরুল ইসলাম সাহেবের ট্রাকেও সে ষোলো জন করে পুলিশ দিয়ে দেয়। কামরুজ্জামান সাহেবের লাশ হেলিকপ্টারে করে রাজশাহীতে যায়।

ভোর রাতে তোমাদেরকে নিয়ে তোমার মফিজ কাকাসহ তোমার আব্বার লাশ দেখতে যাই। তোমার মফিজ কাকা দেওয়ালে মাথা ঠুকরে বলছিল– আমি বাঁচতে চাই না। ভাই সাহেবকে যারা মেরেছে তাদেরকে মেরে আমি মরতে চাই। আমি তখন তোমাদেরকে ধরে কাঁদছিলাম।

(২৮ জুন, ২০১০)

দিপি ইসলাম

আমার চাচাতো বোন

বড় কাকার শরীরের তিন জায়গায় গুলি দেখেছিলাম। উরু, পায়ের গোড়ালি ও কোমরের এক পাশের মাংস ঝুলে থাকতে দেখেছিলাম। রিমি আমাকে বলে যে

চল মনসুর আলীর বাসায় ওনাকে দেখতে যাই। তখন আমি ও রিমি ছোট। জানতাম না যে ওই পরিস্থিতিতে একাকী যাওয়া বিপজ্জনক। সোহেল বড় কাকার লাশের মাথার কাছে অনেকক্ষণ বসে ছিল। তারপর আবার একা একা ঘুরছিল। মিমি একতলা দোতলা করছিল।

(২৮ জুন, ২০১০)

নজরুল ইসলাম খান (বাবুল)

মেজ মামা বললেন, রেডিও হঠাৎ কেন বন্ধ হলো ? দেখ তো ভাবির কাছে গিয়ে খবর নাও। মেজ মামা অসুস্থ থাকায় উনি না যেয়ে আমাকে পাঠালেন। সকাল ৮টার দিকে। মামানি তখন বারান্দার ডাইনিং টেবিলের স্পেসে বসা। উনি আমাকে মধ্যগগনের সূর্যের স্বপ্নের কথা বললেন। আমি ভাবলাম যে সূর্য দেখা তো ভালো। এটা ভালো স্বপ্ন। হয়তো মামার কাছে ভালো দায়িত্ব আসবে। আমি তখন চলে গেলাম। তোমরা সকাল ৯টার দিকে গাড়ি করে নানাসহ মফিজ মামার বাসায় আসলে।

(২৮ জুন, ২০১০)

আমার নোট: বাবুলের তথ্য সঠিক কারণ আম্মা সকাল ৭টার দিকে স্বপ্নের কথা আমাদের জানায়। আম্মা তখন জেগে উঠেছেন।

ড. এম. এ করিম

আব্বুর বন্ধু

সকাল ৭-৩০টার দিকে অ্যাডভোকেট মেহেরুননেসার বাসার সামনে তোমার আম্মাকে জেলহত্যার খবর জানাই। ভোরবেলায় ডাক্তার সেকান্দার, জেলের কাছেই বকশিবাজারে চেম্বার ছিল, আমাকে ফোন করে জানান যে জেলখানার ভেতরে গুলি করে হত্যা করেছে। আমাদের ছাত্রজীবন থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের বন্ধু তাজউদ্দীন আর নেই।

আমি তাজউদ্দীনের উরুতে বুলেটের ক্ষত দেখি। কোমরের দিকে তাকাইনি। ওর চেহারা ছিল শান্তিপূর্ণ– clean shaved.

(২৮ জুন, ২০১০)

আফসারউদ্দীন আহমদ

আমার কাকু

ছোট কাকু, ৩রা নভেম্বর জেল গেটে কে গিয়েছিল ?

আমি যাইনি জেলগেটে। 'শাহিদ সাইন করে লাশ নেয়।' খুররম যায়নি। মেজর আতাউর রহমান তখন জেলগেটে ডিউটিতে ছিল।

কবরস্থানে আমি গিয়েছিলাম। পুলিশের বাধায় খুব বেশি লোক কবরস্থানে যেতে পারেনি। ভাই সাহেব ব্লিডিং হয়ে মারা গিয়েছে।

কোথায় গুলি লেগেছিল ?

পায়ের মধ্যে গুলি লেগেছিল। সুমির বাবা সাঈদকে বললে, ও বলতে পারবে কোথায় কোথায় গুলি ছিল।

(২৮ জুন, ২০১০)

সামসুল আলম চৌধুরী

সাঈদ ভাই

আব্বুর শরীরের কোথায় গুলি দেখেছিলেন ?

(সাঈদ ভাই সাথে সাথে উত্তর দেন) মোট তিনটা গুলি লেগেছিল। পায়ের গোড়ালির জয়েন্টে একটা, উরুতে একটা আর একটা নাভি হতে ৬/৭ ইঞ্চি দূরত্বে ডান কোমরের হাড়ের সন্ধিক্ষণে। কিডনি বরাবর। গোসল করানোর সময় আমি দেখেছি। হাইয়ের বাবাও দেখেছে।

(২৮ জুন, ২০১০)

আমার নোট : সাঈদ ভাইয়ের তাৎক্ষণিক উত্তর ও ডিটেইল বর্ণনা শুনে বোঝা গেল যে গুলির স্থানগুলো ওনার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। অন্যরা আব্বুর পুরো শরীর দেখেনি।

দিপি, সাঈদ ভাই ও হাইয়ের বাবা সম্পূর্ণ বর্ণনা দেয়।

রিমি : হাইয়ের বাবা দেখেছে মোট ৩ জায়গায় গুলি ছিল।

(২৮ জুন, ২০১০)

দলিলউদ্দীন আহমদ

দলিল ভাই

আমি ভায়লিনকে নিয়ে টঙ্গী থেকে ঢাকায় আসি। জেলহত্যার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই আমি, আফসার, খালেদ খুররম আরও কজন ট্রাকে করে বনানীতে যাই দাফন করতে। বড় কাকুর জানাজার আগে কালিয়াকৈরের এমপি, পরে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত শামসুল হক সাহেব ও পুলিশের আইজি বললেন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ক্যান্টনমেন্টে গোলমাল চলছে। লাশ এখুনি নিতে হবে বনানীতে।

(২৮ জুন, ২০১০)

নার্গিস আক্তার

আওয়ামী লীগ নেতা শামসুজ্জোহা সাহেবের মেয়ে

ক্যানাডা প্রবাসী নার্গিস জানায় যে তার বাবা নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের নেতা শামসুজ্জোহা ছিলেন মনসুর আলীর কক্ষে। যখন ৩রা নভেম্বর রাতে আর্মিরা এল। উনি ওজু করলেন। শামসুজ্জোহা বললেন, ওজু করলেন কেন ? মনসুর আলী বললেন– তিনি আশংকা করছেন যে মেরে ফেলবে।

(৬ জুলাই, ২০১০)

দুঃস্বপ্নের রাত

সাইকোলজির ক্লাস। ড. গারসিয়া স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ ঘটে অবচেতন মন থেকে। মনের ভেতর জমে থাকা আনন্দ-বেদনা, শঙ্কা-দ্বন্দ্ব ইত্যাদি চেতন মনের স্তর, পেরিয়ে অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকে। কখনো স্বপ্নের মাধ্যমে বা আলাপে-আচরণে অজান্তেই ওই জমে-থাকা অনুভূতিগুলো প্রকাশ পায়। প্রশ্নোত্তর পর্বে আমি হাত তুলে প্রশ্ন করলাম : "স্বপ্ন কি ভবিষ্যৎ দেখাতে পারে ?" গারসিয়া মাথা নাড়ালেন, বললেন, "আমার জানামতে, না। তবে প্যারাসাইকোলজিস্টরা স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা করে বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য বের করেছে। তুমি তাদের রিপোর্ট পড়ে দেখতে পার।" তাদের রিপোর্ট পড়ে আমার প্রশ্নের জবাব খোঁজার দরকার হয়নি। আমি শুধু চেষ্টা করেছিলাম আমার জীবনের অভিজ্ঞতাকে বৈজ্ঞানিক তথ্যের মাধ্যমে মিলিয়ে দেখার।

আজ থেকে ১৮ বছর আগে ২ নভেম্বর দিবাগত রাতে আমার মা ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন। স্বপ্নটি হলো এ-রকম : মধ্যাহ্নের দুপুরে আমার বাবা এক বাগানের মাঝখানে সিংহাসনে বসে রয়েছেন। পরণে ধবধবে সাদা হাফহাতা গেঞ্জি, হঠাৎ করেই মধ্যাহ্নের সূর্যের জ্বলন্ত দীপ্তি গেল স্তিমিত হয়ে যেন শেষ বিকেলের ক্লান্ত সূর্য একটু পরেই রাতের নিদ্রায় ঢলে পড়বে। মধ্যাহ্নের ওই ঢিমে সূর্য থেকে অস্তগামী সূর্যের লাল আলো আমার বাবার সমস্ত মুখ ও দেহকে রক্তের মতো রঞ্জিত করে দিতে থাকল। মনে হলো বাবা যেন রক্ত দিয়ে স্নান করছেন। ঘুমের মধ্যেই মা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন 'মধ্যাহ্নের সূর্যের রং এত লাল হয় কী করে' ? কে যেন অদৃশ্য থেকে বলে উঠল: "ভয়ংকর বিপদ সারা জাতির উপর নেমে আসছে।" ঘেমে-নেয়ে আমার মা দুঃস্বপ্ন থেকে জাগলেন আরো ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন মোকাবেলা করার জন্য। দুঃস্বপ্নের শুরু এমনি করেই। ৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় আমার বাবা মরহুম তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁর আরো তিন সাথি মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান যাঁর যাঁর ঘরে ফিরে এলেন রক্তে রঞ্জিত হয়ে। ২ নভেম্বর

দিবাগত রাত থেকে তাঁদের মরদেহ ৪ নভেম্বর পর্যন্ত জেলেই পড়েছিল। আমরা এই ভয়াবহ সংবাদ প্রথম জানতে পারি ড. করিম মারফত, ৪ নভেম্বর সকাল ৭:৩০ এর দিকে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি যে সত্যই ঘটে গিয়েছে সে-বিষয়ে সন্দেহ দূর হয় যখন বিকেলের দিকে পাকা খবর আসে। বছর চারেক আগে যখন জেলহত্যার ওপর তথ্য সংগ্রহ করছিলাম, তখন এক মর্মান্তিক তথ্য জানতে পারি। হুদা নামের একজন জেল-ডাক্তার মরদেহগুলো পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন আমার বাবার মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল অধিক রক্তক্ষরণ। কারণ তার শরীরের কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গুলি ছিল না। মোট দুইটি গুলির একটি তার বুকের এক পাশে লাগে কিন্তু হৃৎপিণ্ডে বা ফুসফুসে লাগেনি। অপরটি উরু ও কোমরের সন্ধিক্ষণে প্রবেশ করে। এই দ্বিতীয় জায়গা থেকে সবচেয়ে বেশি রক্তক্ষরণ হয়েছিল এবং সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা হলে তার বাঁচবার আশা ছিল।* ড. হুদার এই মন্তব্যে এবং সে-সময় জেলখানায় মরহুম চার নেতার সাথে বন্দী বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপের পর মনে বারবার এই প্রশ্ন জেগেছে, কর্নেল রশীদ প্রেরিত, খন্দকার মোশতাক নির্দেশিত

মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে মার্চপাস্টে সালাম নিচ্ছেন যুদ্ধকালের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ

---

* পরবর্তী সময় অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার হতে তাজউদ্দীন আহমদের মোট ৩টা গুলিবিদ্ধ হওয়ার কথা জানা যায়। একটি গুলি পায়ের গোড়ালিতে, অপরটি উরুতে এবং তৃতীয় গুলি কোমরের হাড়ের সন্ধিক্ষণে প্রবেশ করে। এই তৃতীয় জায়গা থেকেই সবচেয়ে বেশি রক্তক্ষরণ হয়েছিল। জনাব বুলবুলের সাক্ষাৎকারে ড. হুদাও ঐ একই স্থান হতে অধিক রক্তক্ষরণের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

বি. দ্র : এই ফুটনোটটি ১৪ নভেম্বর, ২০১৪ সংযোজিত হলো।

ঘাতক সুবেদার মোসলেম ও তার দল ওই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে চলে যাবার পর তৎকালীন জেল কর্তৃপক্ষ কোথায় ছিলেন ? জেলার আমিনুর রহমান ৪ নভেম্বর সকালে আইজি নূরুজ্জামান-এর নির্দেশমতো মরহুমদের সেলে ঢুকেছিলেন মরদেহ ধোয়াবার ব্যবস্থা করতে। মধ্যবর্তী সময়টাতে হত্যাকাণ্ডের পর হতে ৪ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত তারা উধাও ছিল। সেই সঙ্গে উধাও ছিল আমাদের বিবেক ও মনুষ্যত্বের অহংবোধ। দুঃস্বপ্নের শুরু ওইভাবে। নাকি আরো আগে থেকেই ?

১৯৭১। পুরো জাতি তখন যুদ্ধে লিপ্ত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আগ্রাসন সেদিন শুধু আওয়ামী লীগের উপরই ছিল না। তারা শপথ নিয়েছিল আমাদের পুরো জাতিকেই পঙ্গু করে রাখবে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়ে। জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলগুলো সেদিন শোষিতের পক্ষে না অংশগ্রহণ করে শোষকের দোসর হয়ে অত্যাচারের মাত্রা আরো ভয়াবহ করে তুলেছিল। বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম ছিল সেদিন দুই শত্রুর বিরুদ্ধে: একটি হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, অপরটি বাংলার মাটিতে লালিত-পালিত হওয়া তথাকথিত ইসলাম-প্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে। '৭১ সালে ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে গঠিত মুজিবনগর সরকারও সেদিন দুটি ভয়ানক শত্রুর মোকাবেলা করছিল। তার মধ্যে প্রথম শত্রুরা দলের ভেতরেই অবস্থান করছিল। খন্দকার মোশতাক, মাহবুবুল আলম চাষী ও তাহেরউদ্দীন ঠাকুরের যোগসাজশে খন্দকার মোশতাক সে-সময় মার্কিন দূতাবাসের সহায়তায় মুক্তিসংগ্রামকে বানচালের যে ষড়যন্ত্র করছিলেন তাকে বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ প্রতিহত করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ষড়যন্ত্রকারী মোশতাক এবং অন্যান্য যারা মুক্তিসংগ্রামকে দ্বিধাবিভক্ত করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বরং তাদের অনেকেই সরকারি ক্ষমতার উচ্চে আসীন ছিল। ঘাতক দালালদের এক বড় অংশ বিচার সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সাধারণ ক্ষমার ফলে রেহাই পেয়ে যায়।** তৎকালীন

** সুনির্দিষ্ট বড় অপরাধে অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের সাধারণ ক্ষমা প্রদান করা হয়নি। তা সত্ত্বেও অনেক বড় অপরাধী ও খুনি মুক্তি লাভ করে। যেমন শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণকারী ও তার হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত দশ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আল বদরের সদস্য খালেক মজুমদার মুক্তি লাভ করে। শহীদ বুদ্ধিজীবী ও চিকিৎসক ড. আলীম চৌধুরীর হত্যার সাথে আল বদরের অন্যতম সংগঠক মাওলানা মান্নান জড়িত দাবী করেছেন শহীদের পরিবার। তিনিও মুক্তি লাভ করেন। জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করেন। এর ফলে ১১ হাজার বা তারও উর্ধ্বে যুদ্ধাপরাধী ও গণহত্যাকারী যারা বিচারাধীন ছিল এবং সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়নি তারাও বেরিয়ে এসে সসম্মানে

আওয়ামী লীগ সরকার যখন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির বদলে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করছিল, এবং মুক্তির অন্যতম শর্ত ন্যায়বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিন তখন স্বাধীনতার শত্রুরা একত্রিত হয়ে দেশময় ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। এই লক্ষ্যে '৭৫ অবধি যেক'টি অপপ্রচার দেশময় ছড়ানো হয়েছিল তার একটি হলো অগণিত মানুষের অশ্রু ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা আওয়ামী লীগ ও ভারতের ষড়যন্ত্রের ফল। এতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিভ্রান্ত হয় ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস থেকে। '৭১-এর ইতিহাস যেন শঙ্কা ও সন্দেহে তাদের তাড়িত করে এবং সেই সুযোগটি স্বাধীনতার শত্রুরা গ্রহণ করে নতুন পাকিস্তান গঠনের লক্ষ্যে। ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবেও আওয়ামী লীগের শোষণ ও দুর্নীতিকে দায়ী করা হয়। তাদের এসব প্রচারণা খুবই সফলতা লাভ করে এবং আওয়ামী লীগ খুব শিগগিরই জনপ্রিয়তা হারায়। এজন্যে আওয়ামী লীগ সরকার নিজেও বহুলাংশে দায়ী ছিল। উদাহরণস্বরূপ ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের কথাই ধরা যাক। ওই দুর্ভিক্ষ ঘটার কারণ আওয়ামী লীগ নয়। ১৯৭৩-এ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের ফল হিসেবে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির হার ১০-১২ শতাংশ হতে মাইনাস ৩-১ শতাংশে নেমে আসে। তেলের মূল্য প্রতি ব্যারেলে আড়াই ডলার হতে তিন মাসের মধ্যে ১২-১৪ ডলার বৃদ্ধি পেয়ে পরবর্তীতে ৩২-৩৪ ডলারে এসে ঠেকে। সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর বিরাট ধাক্কার জের এত বছর পরও উন্নত দেশগুলো যখন সামাল দিয়ে উঠতে পারেনি, তখন বাংলাদেশের মতো সদ্যস্বাধীন, যুদ্ধবিধ্বস্ত, দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের পক্ষে সেই ধাক্কাকে সামাল দেওয়া খুবই অসম্ভব ছিল। আবার ওই সময়ই আন্তর্জাতিক বাজারে সিনথেটিক প্রবেশ করায় পাটের চাহিদাও দারুণভাবে পড়ে যায়। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, ঠিক ওই দুঃসহ সময়টাতে আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের পাশে ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারেনি। পরবর্তী ৭৪ সালের শেষে মন্ত্রিসভা থেকে মুক্তিযুদ্ধের নেতা তাজউদ্দীনের বিদায় এবং তার পরেই কিসিঞ্জারের বাংলাদেশে আগমনে মোশতাক-চক্রের ষড়যন্ত্র একটি বিশেষ রূপ ধারণ করে। '৭৫-এ বাকশালের মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা গঠনের ফলে ভেতর ও বাইরের শত্রুদের শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়,

---

পুনর্বাসিত হয়। সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্যতম দালাল শাহ আজিজুর রহমান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রী হন। বাংলাদেশ বিজয় অর্জনের পর পলাতক বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী নৃশংস আল বদর দল প্রধান ও উপপ্রধান মতিউর রহমান নিজামী এবং আলী আহসান মুজাহিদও বিএনপি সরকারের আমলে পুনর্বাসিত হয়। ২০০১ সালে খালেদা জিয়া দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রী হয়ে এই দুই ঘাতককে মন্ত্রী বানান।

বি. দ্র : এই ফুটনোটটি ১৪ নভেম্বর, ২০১৪ সংযোজিত হলো।

যে সময়টাতে সারা বিশ্ব 'ঠান্ডাযুদ্ধের' কাঁপুনিতে দিশেহারা। বাকশাল গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ তথা ওই অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধির শঙ্কা ও যুদ্ধে-পরাজিত পাকিস্তানের অর্থাৎ মার্কিন বলয়ের স্ট্রাটেজিক শক্তি পুনরুদ্ধারের সংকল্পে বিভিন্ন শক্তি মহাব্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশে তখনো দুর্ভিক্ষের হাহাকার, আওয়ামী লীগের ওপর সাধারণ মানুষ মহাখাপ্পা। ওদিকে আবার যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুদেশ কিউবার সঙ্গে ব্যবসা করার শাস্তি হিসেবে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্যচালান বন্ধ। এমনি এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ক্যু-পারদর্শী লোকদের জন্য সুবর্ণ সুযোগেরই পথ করে দেয়। আওয়ামী লীগের ভেতরের চক্রান্তকারী, বাইরের ঘাতক দালাল বাহিনী, সামরিক বাহিনীর একাংশ ও বহিঃশক্তির সম্মিলিত প্রয়াসে ঘটে যায় ১৫ আগস্টের বীভৎস হত্যাকাণ্ড। ইতিহাসের যে মর্মান্তিক ধারা শুরু হয় তার কুঠারাঘাত শুধু দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ওপরই পড়েনি, বিগত ২৫ বছরের সংগ্রাম ও স্বাধীনতার চেতনাবোধের ওপরে এসে পড়ে। ক্যু ঘটানোর একটি অন্যতম কারণ হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয়। কিন্তু শুধু দল হিসেবে আওয়ামী লীগই সেই খেসারত দেয়নি, পুরো জাতিকেই তা দিতে হয়েছে। ঠুনকো ও বিক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে কখনো পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বচ্ছ মূল্যবোধের সৃষ্টি হতে পারে না। অথচ বাংলাদেশের ভাগ্যে তাই ঘটে যায়। তাই তো রক্ত ঝরিয়ে আবারও সংঘটিত হয় ৩ নভেম্বর। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এমনি করেই বলিদান হয়।

৩ নভেম্বরের মাস দুই পর আমার স্কুলের এক সহপাঠিনী আমাকে খুব দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে : "শুনলাম তোমার বাবা ও অন্যান্যকে হত্যা না করা হলে ইন্ডিয়া নাকি আমাদের দেশ দখল করে নিত ?" বয়স তখন অনেক কম। দুচোখে কৈশোরের জ্বলন্ত দীপ্তি ছড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম তার কথার। তার বহুদিন পর আমার বাবার গুটি গুটি ক্ষুদ্রাকারে লেখা যুদ্ধের সময়কার ডায়রি ও ফাইলপত্র ঘেঁটে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাই। তার কিছু অংশ মূলধারা '৭১ নামের বইটিতে ছাপা হয়েছে এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান ও তাঁর সহযোগীরা তার ওপর গবেষণা করছেন। ওই ডায়েরি থেকে নির্বাচিত অংশ ভোরের কাগজ-এ ছাপাও হয়েছে। তথ্যগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বানোয়াট গুজবের কিছুটা জবাব হতে পেরেছে বলে আশা রাখি।

বাবাকে লেখা ভারতীয় জেনারেল অরোরার একটি চিঠিতে লেখা ছিল আপনার নির্দেশ মতো ভারত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত আমার সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করবে না এবং বাংলাদেশ সরকার ঠিক যতদিন চাইবে ততদিনই শুধু ভারতীয় সৈন্য

বাংলাদেশে অবস্থান করবে।*** মুক্তিযুদ্ধের অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়ে ও তার সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে এ-ধরনের শর্ত তৈরি ও প্রয়োগ খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। অথচ এ-ধরনের শর্ত আরোপিত হতে পেরেছিল কারণ সেদিন যে মানুষটি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, নীতিজ্ঞান বাদে মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয় না। সার্বভৌমত্ব বাদে স্বাধীনতার ফসল ফলে না।

আবার এসেছে দুঃস্বপ্নের রাত ৩ নভেম্বর। এই দিনের স্মরণে জাতীয় চার নেতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। নিঃশব্দ বেদনার একটা ছিন্নভিন্ন হাহাকার হৃদয়কে তাড়িত করে ফেরে। বেদনাবিধুর অশ্রুসিক্ত চোখ আমার খুঁজে ফেরে স্বাধীনতার স্বপ্নকে, ওই দুঃস্বপ্নের রাত পেরিয়ে।

ভোরের কাগজ : ঢাকা
৩ নভেম্বর, ১৯৯২

*** সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদের সাথে ইন্দিরা গান্ধীর চুক্তি হয়েছিল যে ভারত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করবে না এবং বাংলাদেশ সরকার ঠিক যতদিন চাইবে ততদিনই শুধু ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে।
বি. দ্র : এই ফুটনোটটি ১৪ নভেম্বর, ২০১৪ সংযোজিত হলো।

একটি সুন্দর দিনের অপেক্ষায়

গত ৭ সেপ্টেম্বর জেল হত্যার রায় বের হওয়ার কথা ছিল অথচ রায় বের হলো না। কারণস্বরূপ বলা হলো যে বিচারক মতিউর রহমান উচ্চরক্তচাপজনিত কারণে অসুস্থ, যদিও তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়নি বা কোন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন তাও জানা যায়নি।

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ভোর রাতে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক ও মেজর রশীদের নির্দেশ অনুসারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্টেনগান, এস.এল.আর প্রভৃতি অস্ত্রসহ প্রবেশ করে ঘাতক ক্যাপ্টেন মোসলেম ও চারজন সেপাই। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতা—স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, উপরাষ্ট্রপতি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অর্থমন্ত্রী মনসুর আলী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামরুজ্জামানকে গুলি করে হত্যা করে।

তৎকালীন ইন্সপেক্টর জেনারেল নূরুজ্জামানের দেওয়া প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী রশীদ ও খন্দকার মোশতাক বঙ্গভবন থেকে ফোন করে তাঁকে নির্দেশ দেয় ঘাতকদের চার জাতীয় নেতার কাছে পৌঁছে দিতে। স্বয়ং ঘাতক মোসলেমও আইজি প্রিজন্সকে জানায় হত্যার পরিকল্পনা এবং মোশতাক আইজিকে নির্দেশ দেয় ঘাতকের কথানুসারে কাজ করতে।

ডিআইজি প্রিজন্স আব্দুল আউয়ালের পেশ করা রিপোর্ট অনুযায়ী ঘাতক মোসলেমের নির্দেশে চার নেতাকে অন্যান্য বন্দীদের থেকে আলাদা করে ১নং ওয়ার্ডে জড়ো করা হয়। ওই ওয়ার্ডে তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অন্য বন্দীদের সঙ্গে থাকতেন। সকল বন্দী থেকে তাঁদেরকে আলাদা করে একত্র করার পর ঘাতক মোসলেমের নেতৃত্বে তাঁদের ওপর গুলি চালানো হয়। গুলি করার পর অতিসত্বর ঘাতকের প্রথম দল ৪টা ৩৫ মিনিটে জেলখানা ত্যাগ করে এবং ৫টা ২৫ মিনিটে বঙ্গভবন থেকে নায়েক এ. আলীর নেতৃত্বে

আরও একটি সশস্ত্র দল জেলখানায় প্রবেশ করে, এবং মনসুর আলী ও নজরু
ইসলামের দেহে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যাকে নিশ্চিত করে। উল্লেখ্য চা
নেতাকে গুলি করে হত্যার সময় ঘটনাস্থল থেকে ৪০ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আই
ও ডিআইজি প্রিজন্স গুলি করার বিকট শব্দ শুনতে পান। তৎকালীন জেলা
আমিনুর রহমান ও জেলের সুবেদার আব্দুল ওয়াহেদ মৃধার রিপোর্ট অনুসা
হত্যাকাণ্ডটি ঘটে তাদের চোখের সামনেই। আইজি বা ডিআইজি প্রিজ
ঘাতকদের হত্যার পরিকল্পনা তাদের কাছে ব্যক্ত করেননি, শুধু নির্দে
দিয়েছিলেন ঘাতকদের চার নেতার কাছে পৌঁছে দিতে। তাঁদের ধারণা ছিল ে
নতুন কোনো মন্ত্রিসভা হবে, সেখানে তাঁদের নিতে এসেছে। [চার নেতা
বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর মোশতাকের মন্ত্রিসভার যোগদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যা
করেছিলেন]। তাজউদ্দীন আহমদের প্রশ্নের জবাবেও তাঁরা মন্ত্রিসভা
যোগদানের ধারণাকেই ব্যক্ত করেন। তাজউদ্দীন সেই উত্তর বিশ্বাস করেননি
তিনি তাঁর তিন সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন 'সময় নেই, ওজু ক
আসেন'। তারা চার জনই ওজু করে এলেন। নামাজও আদায় করলেন। তাঁ
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার পর, জেলার আউয়াল ১নং ওয়ার্ড থেকে কিছু দূ
দাঁড়ানো আইজিকে জানালেন যে চার নেতাকে ১নং ওয়ার্ডে একত্রিত ক
হয়েছে। এ-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই পাশে দাঁড়ানো ঘাতকরা ১নং ওয়ার্ডে
দিকে দ্রুত হাঁটা শুরু করে। তাদের পেছনে জেলারও ঘরে ঢোকে। সুবেদা

ওয়াহেদ মৃধা সর্বক্ষণই চার নেতার পাশে দণ্ডায়মান ছিল। জেলার চৌকিতে বসা চার নেতার সঙ্গে ঘাতকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ার মুহূর্তেই ঘাতকরা সামনাসামনি দাঁড়িয়ে চার নেতাকে লক্ষ্য করে ৬০ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তাজউদ্দীন আহমদের কুরআন শরিফ, টিনের ছাদ, ফ্লোর ও বাকি আসবাবপত্র।

হত্যাকাণ্ডের পর রশীদ ফোন করে ডিআইজিকে নির্দেশ দেয় মরদেহগুলো যেভাবে পড়ে রয়েছে সেভাবেই ফেলে রাখতে। ৪ নভেম্বর সকালবেলা পর্যন্ত মরদেহগুলো সেভাবেই কারাগার প্রকোষ্ঠে পড়ে থাকে। ঐদিনই, অর্থাৎ ৪ নভেম্বর ডিআইজি লালবাগ থানায় এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার এক কপি তিনি আইজি প্রিজন্স ও স্বরাষ্ট্র সচিবকে দেন। ক'দিন পর একটি তদন্ত কমিটিও গঠিত হয় কিন্তু তার কাজ কিছুই আগায়নি। গত ২১ বছর ধরে জেলহত্যার তদন্তকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বেআইনিভাবে আটকে রাখে। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হওয়ার পর জেল হত্যাকাণ্ডের ওপর আইজি ও ডিআইজি প্রিজন্স-এর ২১ বছর পূর্বে লিখিত প্রতিবেদন প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তদন্ত ও বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়। দীর্ঘ ২৯ বছর পর, প্রচণ্ড বাধা ও বিপত্তির মধ্যে দিয়ে বিএনপি সরকারের আমলে সকল তদন্ত ও বিচারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় যার রায় ঘোষিত হওয়ার কথা ছিল গত ৭ সেপ্টেম্বরে। রায় ঘোষণার দিন পিছিয়ে নতুন দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ২১ সেপ্টেম্বরে। ঐদিন রায় কি সত্যিই ঘোষিত হবে ! যদি ঘোষিত হয় ঐ রায় কি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করবে ?

যদি করে তাহলে ওই রায়টি প্রহসন ও মিথ্যার জঞ্জাল চাপা পড়ে থাকা রুদ্ধ বিচারের দুয়ারটিকে খুলে দিতে আইনের শাসনের পক্ষে একটি সভ্য রাষ্ট্রেরই নিদর্শন রেখে যাবে। নতুন প্রজন্ম তো (অতি বিলম্বে হলেও) এটুকু জানবে যে হত্যাকারী, ষড়যন্ত্রকারী, দুর্নীতি পরায়ণ অরাজকদের রেহাই নেই। তাদের সমুচিত বিচার হবেই। এ জগতেই। পরিশেষে, কারাগারের অন্তরালে সভ্যতা ও আইন লঙ্ঘন করে জাতির চরম দুর্দিনে স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী সৎ, প্রজ্ঞাশীল, নীতিবান, বিনম্র এই মানুষটি নিজ পিতা তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁর তিন সহকর্মীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি বর্ণনা করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। ঘটনা বর্ণনা কালে নিজ আবেগ ও অনুভূতিকে যথাসম্ভব দমিয়ে রেখে একটি রিপোর্টের মাধ্যমেই ঘটনাটিকে পাঠক সমীপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এবারে ফিরে আসছি আমার শৈশবের আবেগ ঘন একটি ছোট্ট স্মৃতিতে, এই বেদনাসিক্ত রিপোর্টের সূত্র ধরেই। আমার বয়স তখন সাত বছর। আব্বু

[এই নামেই তাকে সম্বোধন করতাম] পাকিস্তান সামরিক সরকারের রোষানলে পড়ে ময়মনসিংহ কারাগারে বন্দী। সে-সময় ঈদের ছুটির পর স্কুলে প্রত্যাবর্তন করলাম। কেমন করে ঈদের উৎসব পালন করেছি সে বিষয়ে শিক্ষয়িত্রী শিক্ষার্থীদের কিছু বলতে বললেন। আমার বলার পালা এলে আমি বললাম যে আমাদের পরিবার ঈদের উৎসবে যোগ দিতে পারেনি কারণ আমার বাবা কারাগারে বন্দী এবং সেদিন তাঁকে দেখতে আমরা ময়মনসিংহ কারাগারে গিয়েছিলাম। আমার উত্তর শুনে সহপাঠী ক'জন জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার বাবা কি চুরি, ডাকাতি জাতীয় কিছু কর্ম করেছে ? নতুবা কারাগারে কেন ? আমি আমার ছোট্ট বয়সের জ্ঞান অনুযায়ী প্রতিবাদ স্বরূপ কিছু উত্তর দিয়ে ব্যথিত মনে ঘরে ফিরে আম্মাকে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম।

তিনি ঘটনাটি শুনে বললেন 'এরপর কেউ যদি তোমাকে প্রশ্ন করে যে তোমার বাবা কারাগারে বন্দী কেন তুমি উত্তরে তাকে বলবে "তুমি, তোমার বাবা, মা ও দেশের সকল মানুষ যাতে শান্তি ও নিরাপত্তায় বসবাস করতে পারে সে-জন্যই আমাদের বাবা নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এবং আমরা বাবার স্নেহ ছায়া থেকে বঞ্চিত হয়েছি একটি সুন্দর দিনের জন্যে।"

আজ এতগুলো বছর পরও আমি এবং আমরা সকলেই অপেক্ষা করছি ঐ সুন্দর দিনটির জন্য যে কারণে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে আব্বু ও তাঁর মতো মানুষেরা অমর হয়ে রইলেন বাংলাদেশের হৃদয়ে।

সাপ্তাহিক ঠিকানা : নিউইয়র্ক
১৫ অক্টোবর, ২০০৪

বিচারের বাণী কাঁদে নিভৃতে

জেল হত্যার রায় দু'বার পেছানোর পর অবশেষে গত ২০ অক্টোবর রায়টি সর্বসমক্ষে ঘোষিত হলো দীর্ঘ ২৯ বছর পর। আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে রায়টিতে ন্যায় বিচার প্রতিফলিত হয়নি এবং এতে বহু ফাঁক-ফোকড় রয়েছে। ১৯৮৭ সালে আমার জানামতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে জেল হত্যাকাণ্ডের ওপর সর্বপ্রথম সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ আমাকে দিয়ে শুরু হয়। প্রবাস থেকে দেশে ফিরে গিয়ে আমি আওয়ামী লীগ সরকারের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, রায়ের বাজার আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি মহসীন বুলবুল, জেল হত্যা তদন্ত কমিশনের সদস্য বিচারপতি সোবহান, ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক বীর উত্তম ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। আমার ছোটবোন সিমিন হোসেন রিমি দেশে থেকে ওই সকল সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তথ্য সংগ্রহের কাজ বহু দূরে এগিয়ে নিয়ে যায়, যা পরবর্তীতে তার লেখা আমার ছোটবেলা ১৯৭১ ও বাবা তাজউদ্দীন স্মৃতিকথামূলক বইটিতে স্থান পেয়েছে।

সামাদ আজাদ, মহসীন বুলবুল ও এসপি মাহবুব, ৩ নভেম্বর আততায়ীর গুলিতে নিহত জাতীয় চার নেতার সঙ্গেই কারাগারে বন্দী ছিলেন। বিচারপতি সোবহান আমাকে জানান যে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর জেল হত্যা তদন্ত কমিশনকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তদন্ত কমিশনের অপর সদস্য মরহুম বিচারপতি সৈয়দ মহম্মদ হোসেন মন্তব্য করেছিলেন ৪ নেতাকে হত্যার পর গঠিত তদন্ত কমিশন ছিল একটি প্রহসন (সংবাদ, ৫ নভেম্বর, ১৯৮৪)। '৭৫ এর ৩ নভেম্বরের পরপরই জেনারেল খালেদ মোশাররফ, সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোশতাক সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতাসীন হলেন। খুনিদের অনেকেই তখন দেশ হতে পলায়ন করেছে। ঠিক ওই সময় তিনি জেল হত্যার তদন্তে নিয়োগ করেন ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হককে। উক্ত কর্মকর্তা জেলার ও ডিআইজি প্রিজন্সের সাক্ষাৎকারটি রেকর্ড করেন এবং টেপটিকে ঢাকা সেনানিবাসে তাঁর ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে লুকিয়ে রাখেন। তাঁর মতে এ-খবর

কারোর জানার কথা ছিল না। ৭ নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ নিহত এবং জেনারেল জিয়া ক্ষমতাসীন হন। এরই মধ্যে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তৎকালীন কর্মকর্তা মেজর মাহবুব (পরবর্তীকালে লে. কর্নেল) আশ্চর্যজনকভাবে টেপটির সংবাদ পান এবং অনেক অনুরোধ করে তা নিয়ে যান। এর পর টেপটির হদিস আর পাওয়া যায়নি।
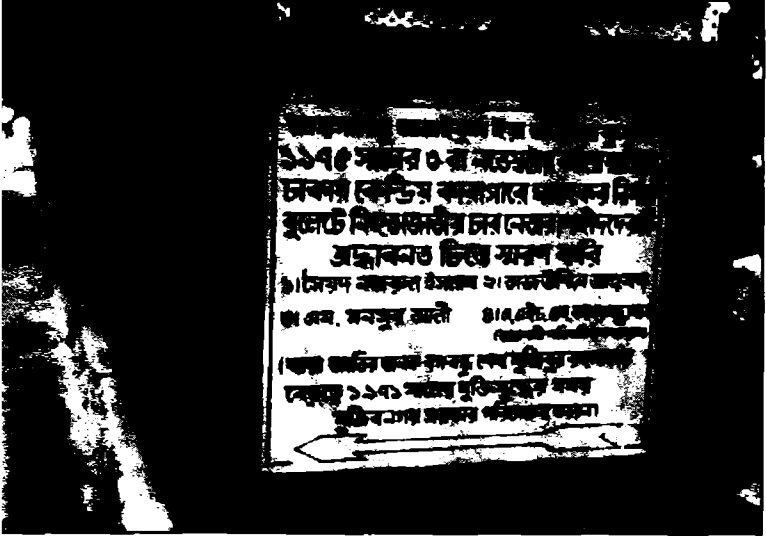
বনানী গোরস্থানে শেষ শয্যায় শায়িত মুক্তিযুদ্ধের চার নেতার কবরের দিক ফলক

ডিআইজি প্রিজন্স আবদুল আউয়াল জেল হত্যার তদন্তে সহায়তা এবং সাক্ষীদের তলবের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বেশ কয়েকবার ডিমান্ড নোটিশ করেন যার উত্তর প্রদানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নীরব ভূমিকা পালন করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর অবর্তমানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী চার জাতীয় নেতা হত্যার পেছনে ছিল এক সুগভীর ষড়যন্ত্র। প্রদত্ত রায়ে বেকসুর খালাসপ্রাপ্তদের অন্যতম তাহের উদ্দিন ঠাকুর প্রসঙ্গে আদালত বলেছে যে তাহের উদ্দিন ঠাকুরের জবানবন্দিতে ষড়যন্ত্রের বিষয়টির আভাস রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ তা প্রমাণ করতে পারেননি (প্রথম আলো: ২১ অক্টোবর ০৪)। আমাদের জানামতে বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুরসহ বেকসুর খালাসপ্রাপ্ত ক্ষমতাসীন বিএনপি'র সাংসদ ওবায়দুর রহমান, বিএনপি নেতা নূরুল ইসলাম মঞ্জুর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা মেজর

(অব.) খায়রুজ্জামানের বিপক্ষে মূল কোনো সাক্ষীকে তলব করা হয়নি। এমনকি অধিকতর তদন্তের এবং প্রমাণাদি সংগ্রহের নির্দেশও দেওয়া হয়নি। উপরন্তু কারাগারে প্রবেশপূর্বক যারা গুলি করে চার নেতাকে হত্যা করল তাদের মধ্যে মাত্র তিনজনের নাম উল্লেখ করে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বাকি সকলে বাদ পড়ল কেন ? তৎকালীন আইজি প্রিজন্স নূরুজ্জামান, ডিআইজি আবদুল আউয়াল, জেলার আমিনুর রহমান ও সুবেদার ওয়াহেদ মৃধা (মৃত) গৃহীত জবানবন্দি অনুসারে চারজন ঘাতকের প্রথম দলটি সুবেদার মোসলেমের নেতৃত্বে কারাগারে প্রবেশ করে। আইজি ও ডিআইজি প্রিজন্সের জবানবন্দি অনুসারে চার ঘাতকের প্রথম দলটি হত্যাস্থল ত্যাগ করার প্রায় এক ঘণ্টা পর নায়েক এ. আলীর নেতৃত্বে আরও তিন/চারজন ঘাতক কারাগারে প্রবেশ করে এবং হত্যাকে নিশ্চিত করার জন্য নেতাদের দেহে বেয়োনেট চার্জ করে। অথচ এ. আলীর নাম মৃত্যুদণ্ডের তালিকা হতে বাদ পড়েছে। তার সঙ্গীরা অনুল্লেখিত এমনকি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মোসলেমের নাম ঠিকানাও অনিশ্চিত। যদিও সে তার বাকি তিন সহযোগীর সঙ্গে কারাগারে প্রবেশের সময় নাম স্বাক্ষরকালে মোসলেম নামটি লিখেছিল আদালত সেই নামটি সম্বন্ধে সন্দিহান। মোসলেমকে পরবর্তীতে মোসলেহ্ উদ্দিন হিসেবেও অভিহিত করা হয়েছে। এ হত্যার পর মোসলেম ও তার সহযোগীদের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। এই প্রেক্ষিতে তাদের ওপর মৃত্যুদণ্ড বলবত হওয়ার কোনো উপায়ই নেই। হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ পালনকারীদের শাস্তি প্রদান করা হলো অথচ রহস্যজনক কারণে ষড়যন্ত্রকারী ও গুরুত্বপূর্ণদের বেকসুর খালাস দেওয়া হলো এই বলে যে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হয়নি। অথচ একই সঙ্গে ষড়যন্ত্র প্রমাণ হয়নি, এই রায় দেওয়া হলেও, প্রায় সব সেনা কর্মকর্তাকে (যাদের প্রায় সকলেই দেশান্তরী) শাস্তি দিয়ে স্ববিরোধিতা করা হয়েছে বলেও অনেকে অভিযোগ করেন।

সাবেক বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর আনিসুল হক রায়টিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হিসেবে অভিহিত করেন (সাক্ষাৎকার, প্রথম আলো, ২১ অক্টোবর, ২০০৪)। রায়টি বের হওয়ার পর ব্যক্তিগতভাবে, গভীর মর্মাহত হলেও আশ্চর্য হইনি। বাংলাদেশের ইতিহাসের গতানুগতিক ধারাই বলতে গেলে অনুরূপ। অতীতেও ষড়যন্ত্রকারীদের পুরস্কৃত করার ভূরিভূরি নজির বাংলার ইতিহাসে রয়েছে। তবে এটি অনস্বীকার্য যে ঘুণে ধরা বিচারের অঙ্গনের বাইরেও রয়েছে একটি অদৃশ্য ও মহান বিচারের ক্ষেত্র, যার অতি চুলচেরা, সূক্ষ্ম বিচার থেকে কেউ-ই নিষ্কৃতি পেতে পারে না। ষড়যন্ত্রকারীরা সত্যিই কি রেহাই পেয়ে গেল, নাকি তারা আজীবন লাঞ্ছিত অপমানিত ও

ঘৃণিত জীবনের অভিশাপ বয়ে বেড়াবে তা ভবিতব্যের বিচার্য। পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজের ভাগ্য বিপর্যয়ের পর মীর জাফর সাময়িকভাবে পুরস্কৃত হয়েছিল। অথচ বিসর্জিত হয়েছিল জনগণের হৃদয় থেকে এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে।

পরিশেষে তৎকালীন আইজি প্রিজন্স নূরুজ্জামান অবসর গ্রহণান্তের পর দীর্ঘ নীরবতার পর ছোট বোন রিমির কাছে মুখ খোলেন। ৩ নভেম্বরের ওই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ওপর তাকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি হৃদয় বিদারক কান্নায় ভেঙে পড়েন। বারবার রিমির কাছে মাফ চেয়ে বলেন যে, কেন সেদিন মোশতাক রশীদের বেআইনি নির্দেশ অমান্য করে নিজে মৃত্যুবরণ করে হলেও চার নেতাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন না। আজ তিনিও তো নিজ বিবেকের কাছে পরাজিত। জেলার আমিনুর রহমান রিমিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছিলেন যে আইজি বা ডিআইজি প্রিজন্স সে-রাতে তাঁকে যদি জানাত যে ওই চার সামরিক ব্যক্তি চার নেতাকে হত্যা করতে এসেছে তাহলে কারাগারের নিরাপত্তার জন্য রক্ষিত অস্ত্রধারী ২০০ বিডিআর সদস্যের সাহায্যে গোলমাল সৃষ্টি করে তাদেরকে বাঁচানো যেত।

এই বিষয়টি নিয়ে বারবার ভেবেছি। এই চার নেতা, যাঁরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত, স্বাধীনতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ জনগণ, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনকে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বের আওতায় একত্রিত করে মুক্তি সংগ্রামের দুর্গম গিরি কান্তারটি সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করেছিলেন এবং মৃত্যুর সম্মুখেও দেশ, দশ ও নীতির প্রশ্নে থেকেছেন অবিচল, তাঁরা তো মৃত্যুঞ্জয়ী ! নশ্বর দেহের মৃত্যু ঘটতে পারে, অবিনশ্বর আত্মা ও আদর্শের মৃত্যু নেই। দেহান্তরিত মহান মানুষের, কর্ম-আদর্শ মৃত্যুহীন আলোক বর্তিকা হয়ে আজীবন পথ দেখায় অতন্দ্র প্রহরীর মতো।

সাপ্তাহিক ঠিকানা : নিউইয়র্ক
৫ নভেম্বর, ২০০৪

জেলহত্যার রায় : ব্যক্তিগত অনুভূতি ও একটি পর্যালোচনা

সুদীর্ঘ বছর, কাল ও মুহূর্তের প্রত্যাশিত জেলহত্যার রায় বের হলো ৩০ এপ্রিল। রায়টি নিয়ে মনে একটা মিশ্র অনুভূতি চলছে। এটিকে সম্পূর্ণ রায় না বলে বলা যেতে পারে আংশিক রায়। এ রায়ে পূর্ববর্তী ২০০৪ সালের তিনজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তর রায়, যা ২০০৮ সালে বদলে ফেলে মাত্র একজনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়, তা বাতিল করে ২০০৪ সালের রায় বলবত করেছে।

২০০৪ সালে প্রদত্ত রায়ে তিন পলাতক অথবা মৃত রিসালদার মোসলেম উদ্দীন, দফাদার মারফত আলী শাহ ও এল ডি দফাদার আবুল হাশেম মৃধাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২০০৮ সালে ওই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আসামিপক্ষের আপিলের মধ্য দিয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত উল্লিখিত দুই দফাদার মুক্তিলাভ করে। আজ, ৩০ এপ্রিল, ২০১৩, রাষ্ট্রপক্ষ আপিলের মাধ্যমে ২০০৪ সালে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড পুনঃবহাল করে।

সে হিসেবে আজকের এ রায়ের মধ্য দিয়ে জেলহত্যাকাণ্ডের বিচারে অগ্রগতি হয়েছে। আশা করা যেতে পারে যে, এ অগ্রগতি সম্পূর্ণ বিচার ও রায়ের পথ উন্মুক্ত করবে।

এ কথাটি বলার কারণ হলো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মূল নেতৃবৃন্দ, চার জাতীয় নেতা, প্রথম বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান এবং অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলীর হত্যাকারীরা কি শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর অধস্তন ওই তিন সৈন্য ছিল? তারা তো নির্দেশ পালনকারী মাত্র! মূল ষড়যন্ত্রকারী, যাদের নির্দেশে এ হত্যাকাণ্ড হলো তারা কোথায়?

বিএনপি সরকারের শাসনামলে রহস্যজনকভাবে দুই বার রায়ের দিন পেছানোর পর, ২০০৪ সালের ২০ অক্টোবর নিম্ন আদালতের রায়ে জেলহত্যার ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে অভিযুক্ত বিএনপির নেতৃবৃন্দ ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, তাহের উদ্দীন ঠাকুর এবং বিএনপি

সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত সেনা অফিসার মেজর (অব.) খায়রুজ্জামান ও মেজর (অব.) আজিজ পাশা বেকসুর মুক্তি লাভ করে।

সে রায়ে খালাসপ্রাপ্ত এবং জেলহত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম হিসেবে অভিহিত তাহের উদ্দীন ঠাকুর সম্পর্কে আদালত বলে যে, তার জবানবন্দিতে ষড়যন্ত্রের বিষয়টির আভাস আছে কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ তা প্রমাণ করতে পারেনি (প্রথম আলো, ২১ অক্টোবর, ২০০৪)।

জানামতে, বেকসুর খালাসপ্রাপ্তদের বিষয়ে আরও তদন্তের এবং প্রমাণাদি সংগ্রহের নির্দেশও আদালত দেয়নি। একই সঙ্গে ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হয়নি, এ রায় দেওয়া হলেও বারো জন সেনাকর্মকর্তাকে, যাদের প্রায় সকলেই তখন দেশান্তরী ও পলাতক তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি দিয়ে স্ববিরোধিতা করা হয়েছে বলে কেউ কেউ সেদিন অভিযোগ করেছিলেন।

তদুপরি ২৮ আগস্ট, ২০০৮, হাইকোর্ট, জেলহত্যায় অভিযুক্ত সেনা অফিসার লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান, লে. কর্নেল (অব.) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ, লে. কর্নেল (অব.)বজলুল হুদা ও লে. কর্নেল (অব.) এ কে এম মহিউদ্দীনকেও মুক্তি দেয়। তারা বিএনপি সরকারের আমলে জেলহত্যা মামলায় ছাড়া পেলেও, পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারে অভিযুক্ত হন। তাদের বিরুদ্ধে ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দণ্ড কার্যকরী হয় ২৭ জানুয়ারি ২০১০; আওয়ামী লীগ সরকারের দ্বিতীয় টার্মে।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু ও জেল হত্যাকাণ্ডের অন্যতম পরিকল্পক খন্দকার মোশতাক আহমেদ, বিএনপি শাসনামলের শেষ দিকে, ৫ মার্চ, ১৯৯৬, কোনো প্রকার দণ্ড মাথায় না নিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর তিনি অর্ডিন্যান্স জারি করেছিলেন যে ১৫ আগস্টের হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না। মোশতাককে অপসারণ করে ক্ষমতায় এসে জিয়াউর রহমান শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সে অর্ডিন্যান্সকে স্থায়ী করে নেন, ১৯৭২-এ গৃহীত দালাল আইন বাতিলসহ স্বাধীনতাবিরোধী ও গণহত্যাকারী শক্তির পুনরুত্থানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকারীদের কূটনৈতিক চাকরিসহ নানাভাবে পুরস্কৃত করেন।

স্বাভাবিকভাবেই বিএনপি ও তার পদানুসারী এরশাদ সরকারের আমলে ১৫ আগস্ট ও জেলহত্যাকাণ্ডের বিচার আশা করা ছিল অবাস্তব। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত জেলহত্যার তদন্তকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বেআইনিভাবে আটকে রাখে। সুদীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়লাভ করার পর

উল্লিখিত বিচারের দুয়ার খুলে যায়। পরবর্তী ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি পুনঃজয়লাভ করলে বিচারের প্রক্রিয়া শিথিল ও বিলম্বিত হতে থাকে।

এসব বেদনাদায়ক জটিলতার মধ্য দিয়ে আজকের জেলহত্যার বিচারে যে রায় বের হয়েছে তাকে আমি সমাপ্তি বলব না; বলব সমাপ্তির পথে যাত্রা। বেকসুর খালাসপ্রাপ্ত যে ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও বেঁচে রয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে বিচারে অগ্রগতির আরেকটি ধাপ। সে সঙ্গে জেলঅভ্যন্তরে ঢুকে বাকি যারা হত্যাকাণ্ড করেছিল তাদের খুঁজে বের করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে।

কথাটি উল্লেখ করার কারণ হলো যে, জেলহত্যাকারী হিসেবে মাত্র তিনজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তারা মৃত্যুদণ্ড লাভ করেছে। কিন্তু বাকি চার-পাঁচ জন বাদ পড়ল কেন? তদানীন্তন আইজি প্রিজন্স নুরুজ্জামান, ডিআইজি প্রিজন্স আব্দুল আউয়াল, জেলার আমিনুর রহমান ও সুবেদার ওয়াহেদ মৃধা জেলহত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী। আমিনুর রহমান ও ওয়াহেদ মৃধার চোখের সামনেই নিউ জেল বিল্ডিঙের ১ নং সেলের ভেতর অন্যান্য রাজবন্দিদের থেকে আলাদা করে জড়ো করা চার জাতীয় নেতার ওপর ঘাতকরা ষাট রাউন্ড ব্রাশফায়ার চালায়। আইজি ও ডিআইজি তখন ঘটনাস্থলের মাত্র ৪০ গজ দূরে দাঁড়ানো।

নব্বই দশকের প্রথমার্ধে গৃহীত ও প্রকাশিত (১৯৯৩-১৯৯৪) ছোট বোন সিমিন হোসেন রিমির অবসরপ্রাপ্ত জেল কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার ও দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৯৬-এর সেপ্টেম্বরে ফাইলের স্তূপ থেকে উদ্ধার করা আইজি ও ডিআইজির ১৯৭৫-এ জেলহত্যার পর লিখিত প্রতিবেদনে জানা যায় যে, রাতের গভীরে ক্যাপ্টেন মোসলেমের নেতৃত্বে চারজন ঘাতক ঢাকা সেন্ট্রাল জেল অভ্যন্তরে প্রবেশ করে চার নেতাকে হত্যা করে। গুলি করার পর দ্রুত ঘাতকের প্রথম দল ভোর ৪:৩৫ মিনিটে জেলখানা ত্যাগ করে। ৫:২৫ মিনিটে বঙ্গভবন থেকে নায়েক এ আলীর নেতৃত্বে তিন-চার জনের আরও একটি সশস্ত্র দল জেলের ভেতর প্রবেশ করে। তারা হত্যা নিশ্চিত করার জন্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং মনসুর আলীর দেহে বেয়োনেট চার্জ করে।

লক্ষণীয় ব্যাপার যে, এ আলীর নাম মৃত্যুদণ্ড থেকে বাদ পড়েছে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দফাদার মারফত আলী শাহ বা আবুল হাশেম মৃধার একজন রিপোর্টে উল্লিখিত নায়েক এ আলী কিনা সে বিষয়টি অনুল্লিখিত। অন্য মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সুবেদার মোসলেমের নাম-ঠিকানাও অনিশ্চিত। ১৯৭৫ সালে স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে দেওয়া প্রতিবেদনে আইজি এবং আইজিকে লেখা

ডিআইজির প্রতিবেদনে মোসলেমের নামের সঙ্গে ক্যাপ্টেন পদবি উল্লেখ করা হয় (দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬)। জেলার এবং ডিআইজির কথায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘাতকেরা জেলগেটের খাতায় নাম সই করে। ওই নামগুলো কি সঠিক ছিল? বা পদবি? মোসলেমের নাম নিয়ে আদালত সন্দেহ প্রকাশও করেছিল। মোসলেমকে পরবর্তীতে মসলেহউদ্দীন হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।

জেলহত্যার দীর্ঘ ৩৮ বছর পরও তারা বা তার সঙ্গের হত্যাকারীদের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। তারা কি আদৌ বেঁচে আছেন না ভিন্ন নামে বসবাস করছেন এ বিষয়ে কোনো আলোকপাত করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে তাদের ওপর মৃত্যুদণ্ড বলবত হওয়ার কোনো উপায় নেই। আর যারা মূল চক্রান্তকারী তারা নির্বিঘ্নে ও দাপটের সঙ্গেই সমাজে চলেফিরে বেড়ালেন। রাজনৈতিক মেরুকরণের ফলে দ্বিধাবিভক্ত আমাদের সুশীল ও বিদ্বৎসমাজও জেলহত্যার বিষয়টিকে তথ্য ও নিরপেক্ষ গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরার তেমন প্রয়াস নেননি যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেবে।

মনে পড়ে ১৯৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যখন বাংলাদেশে যাই এবং জেলহত্যা বিষয়ে তথ্যসংগ্রহর উদ্যোগ নিই, তখন উপলব্ধি করি যে বিষয়টি নিয়ে কত কম নাড়াচাড়া এবং বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ ভ্রমণের অন্যতম কারণ ছিল জেলহত্যার তথ্য জোগাড় করা। সে সময় ব্যাপারটি সহজ ছিল না। স্বঘোষিত বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী কর্নেল ফারুক ও রশিদ তখন জেনারেল এরশাদের ছত্রছায়ায়। দেশে তারা ফ্রিডম পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছেন। গণহত্যাকারী আলবদর ও রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা জেনারেল জিয়াউর রহমানের দালাল আইন বাতিলের বদৌলতে রাজনৈতিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। তাদের কেউ কেউ দুই জেনারেলের সময় মন্ত্রীর পদেও আসীন হয়েছেন। জেলহত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের জেলার আমিনুর রহমান, ডিআইজি প্রিজন আবদুল আউয়াল প্রমুখ তখনও সরকারি চাকরিতে কর্মরত। তাদের পক্ষে তখন সে বিষয়ে কথা বলা বিপজ্জনক।

এমন অবস্থাসত্ত্বেও আমি যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম তারা ছিলেন, জেলহত্যা তদন্ত কমিশনের সদস্য বিচারপতি আবদুস সোবহান, ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক বীর উত্তম, যাকে মাত্র কয়েক দিনের জন্য ক্ষমতায় আসীন মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ নিযুক্ত করেছিলেন জেলহত্যার রাতে উপস্থিত জেল কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য, আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ও

রায়েরবাজার আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি আ স ম মহসীনকে। শেষোক্ত দুজন নিহত চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী ও এ এইচ কামরুজ্জামানের সঙ্গে কারাগারে বন্দী ছিলেন। এ ছাড়াও জেলহত্যার তদন্ত সম্পর্কে ড. কামাল হোসেন ও অ্যাডভোকেট বারী আমাকে তথ্য দেন।

তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা তথ্য ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যে প্রবন্ধটি রচনা করি, তা ছিল আমার জানা মতে জেলহত্যার উপর রচিত প্রথম গবেষণাভিত্তিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি '৩ নভেম্বরের জেলহত্যা ও বিবেকের আত্মাহুতি' শিরোনামে ১৯৮৮ ও পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জেল কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমিনুল হকের ক্যাসেটে রেকর্ডকৃত প্রথম সরকারি সাক্ষাৎকারটি যা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ঢাকা সেনানিবাসের ৪৬ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে গোপনে তিনি রেখেছিলেন, তার সংবাদ কেমন করে যেন আর্মির গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত লে. কর্নেল মাহবুব পেয়ে যান এবং অনেক অনুরোধ করে উনার কাছ থেকে নিয়ে যান। জেনারেল মঞ্জুর নির্দেশিত জিয়া হত্যার ব্যর্থ অভ্যুত্থানে নিহত হন মাহবুব। ক্যাসেটটির সন্ধান আর পাওয়া যায়নি।

আমিনুল হক উনার রেকর্ড করা সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে জানান যে, ৩ নভেম্বর রাতে বঙ্গভবন থেকে ফোনে তদানীন্তন মেজর খন্দকার আবদুর রশীদ অস্ত্রধারী ঘাতকদের (যারা জেলগেটে পৌঁছে দম্ভভরে জানিয়েছিল যে তারা হত্যা করতে এসেছে) চার নেতার কাছে নিয়ে যাওয়ার এবং মোশতাক-রশিদের নির্দেশ পালন করার হুকুম দেয়।

খন্দকার মোশতাক! আজীবনের সহকর্মীদের নির্মমভাবে হত্যার মূল পরিকল্পকদের একজন। ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর, সে দিনই ষড়যন্ত্রের মূল নায়কদের অন্যতম খন্দকার মোশতাক তার দুই আস্থাভাজন সহচর মাহবুব আলম চাষী ও তাহের উদ্দীন ঠাকুরকে নিয়ে বাংলাদেশ বেতার ভবনে প্রবেশ করে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার মূল ষড়যন্ত্রকারী ও জেলহত্যার ষড়যন্ত্রকারীরা ছিলেন একই ব্যক্তিবর্গ। সেনাবাহিনীর একাংশ এবং বেসামরিক চক্রান্তকারীদের আঁতাতে এসব নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

এ হত্যাকাণ্ডের বীজ প্রোথিত হয়েছিল ১৯৭১-এ, মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং পরিণত হয়েছিল যুদ্ধপরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচণ্ড কিছু ভুল ও ব্যর্থতার জন্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী মার্কিন নিক্সন-কিসিঞ্জার সরকারের সঙ্গে ১৯৭১ সালে মোশতাক-চাষী-ঠাকুর চক্রের গোপন

আদানপ্রদান হয়। তাজউদ্দীন আহমদের দৃঢ় হস্তক্ষেপ ও স্বাধীনতার প্রশ্নে আপসহীন মনোভাবের কারণে সেদিন তাদের পাকিস্তান-মার্কিন স্বার্থরক্ষাকারী কনফেডারেশন গঠনের ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যায়। মোশতাককে হারাতে হয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদটি।(এ বিষয়ে মঈদুল ইসলাম রচিত 'মূলধারা ৭১' ও লরেন্স লিফশুল্টজ রচিত 'বাংলাদেশ: দ্য আনফিনিশড রেভ্যুলুশন' গ্রন্থে বিশদ তথ্যভিত্তিক বর্ণনা রয়েছে)।

সে একই চক্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর উনার কাছাকাছি হয়, (তাদের অনেকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও বিভিন্ন ক্ষমতাশালী পদভুক্ত হয়)। ১৯৭১ সালের ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের তারা সদ্ব্যবহার করে। বঙ্গবন্ধুর মারাত্মক কিছু ভুল সিদ্ধান্ত ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা এগুতে থাকে। পাকিস্তান কারাগার থেকে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু কখনওই তাজউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে চাননি। যুদ্ধের সময় কার কী ভূমিকা ছিল তা জানার বদলে ষড়যন্ত্রকারীদের তিনি প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

তাদের প্ররোচনায় ও একক সিদ্ধান্তে বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই যুদ্ধাপরাধী ও দালালদের বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা করে দেন। এমনকি ১০ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত খালেক মজুমদার, শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারকে তাঁর গৃহ থেকে অপহরণ করার সময় যার মুখের কালো কাপড় সরে যায় এবং শহীদপত্নী পান্না কায়সার, পরবর্তীতে ধরা পড়ার পর তাকে শনাক্ত করেন, বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত (যেমন আলবদর বাহিনীর অন্যতম সংগঠক মওলানা মান্নান যিনি শহীদ বুদ্ধিজীবী চিকিৎসক ডা. আলীমের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত উল্লেখ করেছেন শহীদ পরিবার) তিনি ও তার মতো অনেক আলবদর সদস্য মুক্তিলাভ করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যায়। তারা গোপনে সংগঠিত হতে থাকে। অপেক্ষায় থাকে নতুন সুযোগের।

দূরদর্শী, সঠিক পরামর্শদাতা ও সকল দুঃসময়ের সঙ্গী তাজউদ্দীন আহমদের শত নিষেধ সত্ত্বেও সব দল ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করে বঙ্গবন্ধু গঠন করেন বাকশাল। দলীয়, প্রশাসনিক ও স্বজনদের দুর্নীতি ও অরাজকতাও শক্ত হাতে দমন করতে ব্যর্থ হন। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী তেলের মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যসঙ্কট ও মার্কিন সরকারের খাদ্যকূটনীতির ফলে সদ্যস্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত শিশুরাষ্ট্রে যখন হাহাকার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে তখন ওই সব ব্যর্থতার কারণে জনমনে তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে।

সদ্যস্বাধীন নতুন রাষ্ট্রের সাবলীল ও বলিষ্ঠ বিকাশের জন্য যে ভিশন, চেতনা, প্রজ্ঞা ও আইনের শাসনের প্রয়োগ অপরিহার্য ছিল তার ব্যাপক

অভাবের ফলে, আন্তর্জাতিক ও তাদের দেশীয় এজেন্টদের চক্রান্তের পথ উন্মুক্ত হয়। ঘটে যায় ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের অমানবিক ও নির্মম হত্যাকাণ্ড।

আমি এক বেদনাবিধুর রক্তসিক্ত স্মৃতির বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আজকের জেলহত্যার রায়কে কেন্দ্র করে উপরোক্ত ঘটনাবলি ব্যক্ত করলাম। কারণ ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিত বোঝা ও বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার জন্য অতীত জানা আবশ্যক।

সর্বশেষে এ আশাবাদ থাকবে যে আজকের এই রায় অদূর ভবিষ্যতে জীবিত ষড়যন্ত্রকারী, যারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে, নথিপত্র বিনষ্টের মাধ্যমে ও আইনের ফোকর সৃষ্টি করে নিজেদের রক্ষা করেছেন তাদের এবং অনুল্লিখিত বাকি ঘাতকদের শনাক্ত করে তাদের বিচার করবে।

আজকের এ আংশিক রায়ে এবং জেলহত্যার বিচারে সমাপ্তি ও সম্পূর্ণতা আনার জন্য তা আবশ্যক। এ পদক্ষেপ প্রতিহিংসার নয় বরং তা হবে দীর্ঘবিলম্বিত সুবিচারের পথ খুলে দেওয়া। জেলহত্যাকারীদের বিচারের মধ্যে জাতি হয়তো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে যে, ন্যায়বিচারের দ্বার এ দেশে চিররুদ্ধ নয়। আজকের রায় হয়তো-বা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মতোই আরও একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। ওই অধ্যায়টি উন্মুক্ত করবে দল-মতের ঊর্ধ্বে ন্যায়বিচারের আলোকিত পথ-সাধারণ-অসাধারণ সকলের জন্য।

আশাবাদ আরও থাকবে যে এই নয়াপ্রযুক্তির যুগে নতুন প্রজন্ম তাদের প্রিয় বাংলাদেশের জন্মের ও তার পরবর্তী সময়ের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস খুঁজে বের করবে। যাতে তারা খুঁজে নিতে পারে সঠিক পথটি এবং রোধ করতে পারে এধরনের নির্মম ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

আমাদের নতুন প্রজন্মকে সহায়তা করার এ গুরুদায়িত্ব দল ও মতের ঊর্ধ্বে আমাদের বিদ্যোৎসাহী ও সুশীল সমাজের সত্যান্বেষী সকলেরই।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম : ঢাকা
৪ মে, ২০১৩

পরিশিষ্ট

স্মৃতিতে অম্লান পঁচাত্তর ৩রা নভেম্বর
ওয়ালিউর রহমান রেজা

এদেশের অগণিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমিও চেয়েছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামানের হত্যার বিচার। কিন্তু এই বিচারের সময় সে-সময়ের ঘটনার কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যা আমার রয়েছে, অনেকেরই সে সুযোগ ঘটেনি। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের গণপরিষদের সদস্য (এমসিএ) এবং '৭৩-এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমপিএ) হিসেবে সে-সময়ের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার কারণে এ-বিষয়ে অনেক অমূল্য অভিজ্ঞতা হয়েছে। এতদিনে ওই সকল হত্যার যে বিচার শুরু হয়েছে এবং সত্য ঘটনা প্রকাশের যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তারই কারণে পঁচাত্তরের নভেম্বর মাসের তিন তারিখের হত্যাকাণ্ডের যে স্মৃতি আজও আমার হৃদয়ে অম্লান হয়ে আছে দেশবাসীকে তা জানানোর তাগিদ অনুভব করছি। এর প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি কথা, আমার উপস্থিতিতে ঘটেছে।

একটা সদ্য স্বাধীন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন অতীব। প্রয়োজন সর্বজন স্বীকৃত জনগণনন্দিত যোগ্য নেতার। সে-রকম একজন মহান নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু একটি নতুন স্বাধীন দেশে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার পথ যেখানে দীর্ঘ ও বন্ধুর সেখানে মহান নেতার সঙ্গে সহযোগী নেতারও ভূমিকা অপরিহার্য। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে দেখেছি স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা গান্ধীকে। (যদিও রাষ্ট্রীয় কোনো ক্ষমতায় তিনি ছিলেন না) মৃত্যুর পর তাঁর সহযোগী নেতা জওয়াহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, আহমেদকার প্রমুখ স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশে পৃথিবীর ইতিহাসের নিকৃষ্ট ঘটনা ঘটে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে। সপরিবারে নিহত হন বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান। তখনো জীবিত ছিলেন তারই সহযোগী নেতা নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যার ঠিক ৮০ দিনের মাথায় তাদেরও হত্যা করে ঘাতকরা।

তার আগে আমরা খবরের কাগজে ছবিসহ সংবাদ দেখেছি, ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য মোশতাক অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু মনসুর আলী তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতুলনীয় দেশপ্রেম এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি অপরিসীম আনুগত্যের জন্য তাঁরা মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেননি।

মতিউর রহমান [আওয়ামী লীগের নেতা] যখন দেশে ফিরে আসেন সেটা অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ হবে। ইতোমধ্যে খন্দকার মোশতাক ও তার সহযোগীদের কুকীর্তি আমাদের কাছে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে থাকে। কিছুটা চাপা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। খন্দকার মোশতাক দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। এই অবস্থায় মতিউর রহমান তাঁর নিজ বাসায় ফিরে যান। তবে রাতে সাধারণত অন্যত্র থাকতেন।

এই সময়, নভেম্বরের এক কি দুই তারিখে, আমাদের হাতে একটা লিফলেট আসে। তাতে জানানো হয় যে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য একটি শোক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শোক মিছিলটি বঙ্গবন্ধুর ৩২ নং নম্বর বাসা পর্যন্ত যাবে। আজ মনে নেই লিফলেটটা কারা দিয়েছিলেন। তবে সম্ভবত নিচে কোনো দল বা ব্যক্তির নাম ছিল না। ৩ তারিখ সকালে নূরুল ইসলাম পাপুসহ আমি মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য রওনা হই। পাপু-ভাই ছিলেন রংপুর জেলার রৌমারি এলাকার প্রাক্তন গণপরিষদের আওয়ামী লীগের একজন সদস্য।

ধানমন্ডি ৭ নম্বর রোড ধরে ব্রিজটা পার হয়ে যখন আমরা মাঠের কাছে এসেছি তখন খবর পেলাম মিছিল আসছে। মিছিলে কারা ছিলেন তার সব মুখ আজ আর মনে পড়ে না। তবে দুটি মুখ আমি স্পষ্ট মনে করতে পারছি। তাঁরা হলেন একজন আওয়ামী লীগ নেতা (তখন জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন) মরহুম মহিউদ্দীন আহমদ এবং অন্যজন বর্তমান কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। আমরা দু'জন তখন ভাবলাম রিকশা করে ৩২ নম্বরের মোড়ে গিয়ে মিছিলে যোগ দেব। সেভাবে কলাবাগান লেক সার্কাসে পৌঁছে দেখি সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন বর্তমান ভূমি প্রতিমন্ত্রী রাশেদ মোশারফ। তিনি আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা রিকশা থেকে নেমে তাঁর কাছে যাওয়ার পর তিনি বললেন, 'মিছিল আসছে। আমরা এক সঙ্গেই তাতে যোগ দেব। আম্মাও ৩২ নম্বর রোডে বঙ্গবন্ধুর বাসায় যাবেন, দোয়া পড়বেন।' আমাকে বললেন, 'আপনাকে আপনার বেয়াইনকে নিয়ে আসতে হবে।' (রাশেদ মোশারফের স্ত্রী আমার

ভাতিজি)। আমরা দাঁড়িয়ে কথা বলছি এমন সময় রাশেদ মোশারফের ভাগ্নে (ডাক নাম বাবুয়া, ভালো নাম মনে নেই, এখন সম্ভবত আমেরিকায় আছে) আমাকে একদিকে ডেকে নিয়ে গেল। সম্ভবত সে তখন নাইন বা টেনে পড়ে। কাছে এসে আস্তে আস্তে বলল, 'নানা আপনি কি খবরটা জানেন !' কী খবর জিজ্ঞাসা করাতে সে বিষণ্নভাবে বলল, 'চার নেতাকে জেলখানায় হত্যা করা হয়েছে।' খবরটা শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। এদিকে আমাদের ধারণা ছিল অন্যরকম। বঙ্গভবনে চলছে গণ্ডগোল। খালেদ মোশাররফ খুনি মোশতাককে সরিয়ে দিচ্ছে। নতুন কেবিনেট হবে। চার নেতা মুক্তি পাবেন। এরকম নানা গুঞ্জন চারদিকে শোনা যাচ্ছে। আমি তাকে বললাম, 'না, তা কী করে হয়। তুমি কার কাছে শুনেছ ?' সে বলল, 'আপনি ছোট মামাকে (রাশেদ মোশারফ) জিজ্ঞেস করেন। খবরটা আসলে ঠিক।' আমি তখন রাশেদ মোশারফকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানালেন, ঘটনা ঠিক। তবে এখুনি এটা প্রকাশ করা সম্ভবত ঠিক হবে না। কেন তিনি একথা বললেন তা আমি বলতে পারব না। তবে আমি আর পাপু-ভাই দু'জনেই বড় মুষড়ে পড়লাম। অধীরভাবে মিছিলের জন্য অপেক্ষা করছি। কিছু একটা করা দরকার বুঝতে পারছি। কিন্তু কী করতে হবে বুঝতে পারছি না। এমন সময় মিছিল এল। রাশেদ মোশারফের মা-সহ আমরা ৩২নং রোডের বাসার সামনে মিছিলের সকলের সঙ্গে দোয়ায় যোগ দিলাম। অনেকে ফুল দিচ্ছে। কিন্তু আমি কোনো দিকেই মন দিতে পারছি না। খুঁজছিলাম এমন কাউকে যার সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করা যায়। এমন সময় ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর সম্ভবত ভাতিজা হবে (নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না, জাফর হতে পারে) দেখা পেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম জেলখানার চার নেতার কোনো খবর জানেন কি না। তিনি জানালেন সম্ভবত তাদের বঙ্গভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হতে পারে। আমি তাকে আমার শোনা খবরটা সোজাসুজি না জানিয়ে বললাম, সম্ভবত সঠিক খবর তিনি জানেন না। শোনা যাচ্ছে, জেলখানায় কোনো অঘটন ঘটে গেছে। সে সময় দেখা পেলাম নীলফামারীর যুবলীগের নেতা এস. এম. সোলায়মানের (বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা)। তাকে জানালাম, চার নেতার হত্যার খবর। তারপর তাকে নিয়ে আমি আর পাপু-ভাই গেলাম ২৮ নম্বর রোডে মতিউর রহমানের বাসায়। তাঁকে জানালাম, এই সর্বনাশা ঘটনার কথা। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি। এটা কীভাবে হয়—জেলখানার ভেতর হত্যা ! যখন তাঁকে জানালাম, রাশেদ মোশারফের ভাগ্নে খবর দিয়েছে এবং তার মামাও জানিয়েছেন খবরটা ঠিক তখন তিনি অস্থিরভাবে লাফিয়ে উঠলেন। সে-সময় একটা গাড়ি এসে থামল।

মতিউর রহমানের স্ত্রী বাইরে থেকে ফিরলেন। তিনিও জানালেন জেলখানায় কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে তিনিও শুনেছেন। মতিউর রহমান তখন আমাদের নিয়ে গেলেন তাজউদ্দীন আহমদের সাত মসজিদ রোডের বাসায়। আমরা সোজা দোতলায় উঠে গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখি পায়াবিহীন দোল খাওয়া একটা চেয়ারে ভাবি (জোহরা তাজউদ্দীন) বসে আছেন। মতিউর রহমান খবরাখবর জিজ্ঞেস করায় বোঝা গেল তিনি জেলখানার হত্যার খবর জানেন না, তবে কিছু একটা গণ্ডগোলের খবর পেয়েছেন। তিনি জানালেন, গত রাতে তাজউদ্দীন আহমদের জন্য খাবারও পাঠানো হয়েছে এবং সে খাবার তার কাছে পৌঁছানো হয়েছে বলে জেনেছেন। তিনি বেশ গম্ভীরভাবেই মতিউর রহমানকে একটু খোঁজখবর নিতে বললেন। হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে নিশ্চিত জানার পরও ওই অবস্থায় আমরা কেউ তাঁকে খবরটা দেওয়ার সাহস পেলাম না। আমরা বেরিয়ে এলাম তাঁর বাসা থেকে। এভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। খবরটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। তাই আমরা গেলাম রাশেদ মোশাররফের মায়ের কাছে। তিনি থাকতেন লেক সার্কাস কলাবাগানে, বঙ্গবন্ধুর বাসার খুবই কাছে। তিনিও তখনি ফিরেছেন ৩২ নম্বর থেকে। তাঁকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি জানালেন, গত রাতে তিনি ছিলেন মনির বাসায় (খালেদ মোশাররফের ডাকনাম আর রাশেদ মোশারফের ডাকনাম চুনী)। ঘটনাটা সত্য ! খালেদ মোশাররফ রাতেই জেলখানায় লোক পাঠিয়ে জেনেছেন জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। ৩২ নম্বর রোডের সামনে আমার এক অনুজ বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে খুঁজছিলেন, নাম আসগর আলী খান। জেলখানার কাছে তাঁর একটা লজেন্স ফ্যাক্টরি আছে। ৩ তারিখ ভোরে ওই ফ্যাক্টরির কর্মচারীদের কাছে জেনেছেন জেলখানায় আগের রাতে প্রচুর গোলাগুলি হয়েছে। পাগলা ঘণ্টি বাজানো হয়েছে। তখন বেলা একটা-দেড়টা হবে। ইতোমধ্যে শহরে ছড়িয়ে পড়েছে জেলহত্যার খবর। পথে পথে মিছিল বেরিয়েছে। জেলহত্যার বিচার চাওয়া হচ্ছে। এভাবে দুপুর গড়িয়ে গেল। খবর পেলাম, চার নেতার লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে আনা হবে। ইতোমধ্যে মাইকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে—পরদিন ৪ নভেম্বর বাদ জোহর বায়তুল মোকাররমে জানাজা পড়া হবে। লাশ নিয়ে এরপর কী করা হবে, কোথায় মাটি দেওয়া হবে—কিছুই আমরা জানতাম না। সে-সময় ওই চার নেতার মধ্যে একমাত্র তাজউদ্দীন আহমদের ঢাকায় বাসা ছিল। অন্য তিনজনের ঢাকায় কোনো নিজস্ব বাড়ি ছিল না। তাই আমরা আবার তাজউদ্দীন আহমদের বাসায় ফিরে গেলাম। সবাই অপেক্ষা করছি কখন লাশ আসবে। এভাবে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত

হলো। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর নেওয়া হচ্ছে। জানানো হচ্ছে—দেরি হবে, সব কাজ শেষ হয়নি। নভেম্বরের রাত। কিছুটা শীত পড়েছে। কুয়াশাও পড়ছে। এভাবে রাত ১১টা পর্যন্ত যখন লাশ এল না আমরা তখন মতিউর রহমানের বাসায় গেলাম রাতটা কাটাতে। সকালে আবার গেলাম তাজউদ্দীন আহমদের বাসায়। ইতোমধ্যে লাশ এসে গেছে। নিচতলায় রাখা হয়েছে লাশ। একটু যেন ফুলে গেছে। খাটিয়ার নিচে বরফ দিয়ে রাখা হয়েছে। খবর পেলাম, তাজউদ্দীন আহমদের বাসার দক্ষিণে পশ্চিম ধানমণ্ডির এক বাসায় ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর লাশ রাখা হয়েছে। গিয়ে দেখি মনসুর আলীর লাশ বেশ শক্ত হয়ে আছে। তিনি হালকা-পাতলা গড়নের লোক ছিলেন। মনে হচ্ছিল বুঝি স্বাভাবিকভাবে ঘুমিয়ে আছেন। অন্য দু'জনের লাশের খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম কামরুজ্জামানের লাশ রাখা হয়েছে ভূতের গলিতে তাঁর এক আত্মীয়ের বাসায়। এখন সম্ভবত বাসাটা বের করতে পারব না। আর সৈয়দ নজরুল ইসলামকে রাখা হয়েছে আরমানিটোলা মাঠের কাছে আর এক বাসায়। এদিকে মতিউর রহমান জানালেন আমাদের সকলের একত্রে বসা দরকার। তৎকালীন জাতীয় সংসদের স্পিকার মালেক উকিলও আসছেন। কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় রয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা খবর পেলাম সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ময়মনসিংহ এবং কামরুজ্জামানকে রাজশাহীতে মাটি দেওয়ার জন্য আর্মির তরফ থেকে হেলিকপ্টারে লাশ সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আমরা প্রথমে মনসুর আলীর ওখানে গেলাম। তাঁকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেটি তাঁর ভাতিজা আফজাল সাহেবের বাসা। আফজাল সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। পাকিস্তান আমলে তিনি সরকারি চাকরি করতেন এবং সোবহানবাগে কোয়ার্টারে থাকতেন। সত্তর সালে তাঁর বাসায় মনসুর আলী সাহেবের সঙ্গে আমি অনেক সময় কাটিয়েছি। আমার বাড়ি যেখানে, যে এলাকার সংসদ সদস্য ছিলাম সেই গাইবান্ধায় মনসুর আলী বিয়ে করেছেন। ভাবি আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচিত। বাসার ভেতর যখন তাঁর কান্নাকাটি সহ্য করা সম্ভব হলো না, বেরিয়ে মোড়ের কাছে আমরা বসলাম। কোথায় কবর দেওয়া হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আলাপ শুরু হলো। শেষে ঠিক হলো সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের কাছে যে তিনজন নেতার কবর আছে তাঁদের পাশে কবর দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা করার জন্য দু'জন গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন মহিউদ্দিন আহমদ, অন্যজন খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস অথবা ব্যারিস্টার শওকত আলী। কিছুক্ষণ পর খবর পাওয়া গেল তাঁদের দু'জনকে আটক করা হয়েছে। জেলে নেওয়া হয়নি। তবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই স্থানে কবর দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। সে-সময়

মতিউর রহমান, মালেক উকিলের সঙ্গে আলাপ করে একজন ছাত্রনেতাকে বললেন খালেদ মোশাররফকে টেলিফোন করতে। আমার যতদূর মনে পড়ে, সম্ভবত এই ছাত্রনেতা বর্তমান যুব প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। বহুক্ষণ চেষ্টার পর খালেদ মোশাররফকে টেলিফোনে পেয়ে মালেক উকিল তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তাঁকে প্রথমে অভিনন্দন জানালেন, এ-যাবৎ যে-সব ব্যবস্থা খালেদ মোশাররফ নিয়েছেন তার জন্য। তারপর বললেন তাঁর কাছে একটাই অনুরোধ যেন লাশ নিয়ে মিছিল বের করেন। বেশ কিছুক্ষণ কথা হওয়ার পর টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে মালেক উকিল জানালেন যে এ-সব বিষয়ে কোনো রাজনৈতিক স্ট্যান্ড নিতে খালেদ মোশাররফ অনীহা প্রকাশ করেছেন। এ-সময় একটা বিষয় আমি বিশেষভাবে লক্ষ করছি, প্রচুর লোকজন সুশৃঙ্খলভাবে তাজউদ্দীন আহমদ ও মনসুর আলীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন।

এভাবে যখন দাফন করা নিয়ে আমরা এক জটিল অবস্থার মধ্যে কাটাচ্ছিলাম সে-সময়ে একটা ট্রাক আসতে দেখা গেল। ট্রাকটা যেন সহজে বের করা যায় সেভাবে ব্যাক করে তাজউদ্দীন সাহেবের বাসার সামনে থামল। কয়েকজন পুলিশসহ একজন অল্পবয়স্ক পুলিশ অফিসার নামলেন। অফিসারটিকে এসপি র‍্যাংকের বলে মনে হলো। তখনো ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) হয়নি। যাহোক তাঁরা এসেছেন লাশ নিতে, দাফনের ব্যবস্থা তাঁরাই করবেন। কাছেই মনসুর আলীরও লাশ ছিল। খবর পাওয়া গেল সেখানেও একটা ট্রাক গেছে। যখন পুলিশ অফিসার লাশ নেওয়ার উদ্যোগ নিলেন তখন মতিউর রহমান জোর প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বললেন, মৃত ব্যক্তি আমাদের আপনজন, তাঁর আত্মীয়স্বজন রয়েছেন, তাঁরা ঠিক করবেন কোথায় দাফন করা হবে। পুলিশ অফিসার জানালেন অযথা বাধা দিয়ে লাভ নেই। তাঁর প্রতি নির্দেশ আছে যেকোনো পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হোক না কেন লাশ তাঁকে নিয়ে যেতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে মতিউর রহমান বললেন, জোর করে নিয়ে যেতে চান, যান। আমি তখন পুলিশ অফিসারকে জানালাম, লাশ আমরা দিতে পারি না, কারণ জানাজা এখনো পড়ানো হয়নি। তিনি আমাদের আধঘণ্টা সময় দিলেন জানাজা পড়ার জন্য। উপস্থিত সকলে রাস্তার মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর জানাজা পড়লেন। একইভাবে মনসুর আলী সাহেবের জানাজা পড়া হলো আফজাল সাহেবের বাসার সামনের জায়গায়। লাশ ট্রাকে ওঠার পর পুলিশ অফিসার যে কোনো একজনকে লাশের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তাজউদ্দীন সাহেবকে যে ট্রাকে উঠানো হয়েছিল মতিউর ভাইকে আমরা সেই ট্রাকে উঠতে বললাম। তিনি তখন অত্যন্ত রাগান্বিত ছিলেন, তাই গেলেন না। তাজউদ্দীন সাহেবের এক ভাই

(নাম মনে নেই)* লাশের সঙ্গে গেলেন। ভদ্রলোক তখন বেশ অসুস্থ, কোনো কঠিন জটিল রোগে ভুগছিলেন। একটা চাদর জড়িয়ে তিনি ট্রাকে উঠলেন। এভাবে দুই জাতীয় নেতার লাশ পুলিশ নিয়ে গেল।

আমরা সকলে বায়তুল মোকাররমে উপস্থিত হলাম। ওখানে আগে থেকেই জানাজা পড়ার প্রস্তুতি চলছিল। ইতোমধ্যে সেখানে খবর পৌঁছে গেছে যে লাশ পুলিশ নিয়ে গেছে। ফলে সিদ্ধান্ত হলো গায়েবানা জানাজা পড়ার। প্রচুর লোকজন শরিক হয় সেই জানাজায়। কিন্তু মসজিদের মধ্যে একদল লোক ছিল যারা জানাজায় শরিক হয়নি। উপস্থিত ছাত্র জনতা তাদের অনুরোধ করার পরও তারা জানাজায় শরিক না হয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায়। জানাজা শেষে এক জনসভা হয় ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতারা যাতে বক্তৃতা করেন। তখনো প্রেসিডেন্ট ছিলেন খন্দকার মোশতাক। সভায় কোনো লিখিত সিদ্ধান্ত নেওয়া না হলে ঐসব বক্তা এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে খন্দকার মোশতাক আহমদকে দেশের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর হত্যা এবং জেলহত্যার বিচার করতে হবে এ-সব শ্লোগান চলতে থাকে। এর দু-একদিনের মধ্যেই খন্দকার মোশতাককে সরানো হয় এবং বিচারপতি সায়েম সাহেবকে প্রেসিডেন্ট করা হয়। একটি বিষয় দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, খালেদ মোশাররফ যে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য ক্ষমতায় (সেনাবাহিনী প্রধান) ছিলেন তাঁর সঙ্গে বর্তমান আওয়ামী লীগ বা তৎকালীন বাকশালের ক্ষীণতমও যোগাযোগ ছিল না। বিষয়টা আমরা বুঝতে পারি। কারণ মালেক উকিল যখন খালেদ মোশাররফকে আমাদের পছন্দমতো স্থানে আমাদের মতো করে লাশগুলো দাফন করার জন্য টেলিফোনে অনুরোধ করেন তখনই প্রথম কোনো শীর্ষস্থানীয় বাকশাল নেতার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁর এই অনুরোধের ফলাফলের কথা আগেই জানিয়েছি। তখনকার বাকশাল নেতা অথবা শহীদ চার নেতার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ হয়নি। আওয়ামী লীগ নেতা বা শহীদ চার নেতার আত্মীয়স্বজনদের তত্ত্বাবধানে নয়, তৎকালীন সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে চার নেতার কবর দেওয়া হয়।

খালেদ মোশাররফ যখন ক্ষমতায় আসে তখন আমরা কেউই জানতাম না দেশে কী হচ্ছে বা কী হতে চলেছে, কারণ রেডিও-টেলিভিশন ২৪ ঘণ্টার উপর বন্ধ ছিল। কোনো ঘোষণা নেই। সে সময় মোশতাক প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও চার নেতার হত্যাকারীরা বঙ্গভবনে অবস্থান করছে। কিন্তু তার মধ্যে লক্ষণীয় দিকটা হলো নভেম্বরের ৩ তারিখের মিছিল ও প্রতিবাদ। ১৫

---

* তাজউদ্দীন আহমদের উল্লিখিত ভাইয়ের নাম মফিজউদ্দীন আহমদ।

আগস্টের হত্যাকাণ্ডের বিমূঢ়তা তখন কেটে যাচ্ছিল। দাবি উঠছিল বঙ্গবন্ধু ও চার নেতার হত্যার বিচার করতে হবে। আজকে যাদেরকে চার নেতার হত্যাকারী হিসেবে আসামি করা হয়েছে লোকের মুখে মুখে তারা কিন্তু তখনই চিহ্নিত হয়েছিল ষড়যন্ত্রকারী-খুনি হিসেবে।

এখানে আর একটা বিষয় সামনে আনা দরকার। আজ বাকশাল গঠন নিয়ে নানা সমালোচনা। কিন্তু সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, পুরাতন পার্লামেন্টের (তেজগাঁও) বারান্দায় শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বাকশাল গঠন হওয়ার পর। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই অনাড়ম্বর। তাৎক্ষণিকভাবে চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা করে স্পিকার রাষ্ট্রপতিকে শপথ গ্রহণ করান। আমি তখন পেছনের বেঞ্চের সামান্য একজন এমপি। এই শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার দায়িত্ব সরকারি কর্মচারী, পার্লামেন্টের অধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ! কিন্তু আজও আমি পরিষ্কার মনে করতে পারছি শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, রিয়াজউদ্দিন ভোলা মিয়া প্রমুখ নিজেরা চেয়ার টেবিল সাজানোর কাজে মেতে উঠেছিল কারণ সামনে নতুন কেবিনেট গঠন করা হবে। তাঁরাই আবার পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর হত্যার জন্য বাকশাল গঠনকে দায়ী করেছেন। বাকশাল গঠনের পর বঙ্গবন্ধুকে প্রথম অভিনন্দন জানিয়েছিলেন আতাউর রহমান খান। আমার জানা মতে, বঙ্গবন্ধু একজনকে স্যার বলতেন তিনি আতাউর রহমান খান।

সে-সময়ের ঘটনা, রাজনৈতিক অবস্থা, নেতাদের অবস্থান, বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত বন্ধু, সুবিধাবাদীদের কার্যকলাপ এ-সবের বিস্তারিত আরো অনেক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জানানোর ইচ্ছা রইল। আজ শুধু মিথ্যা প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি মানুষকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তার একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করব।

তাজউদ্দীন আহমদের লাশ যখন লোকজন দেখতে আসছিলেন তখন রাস্তা থেকে সকলকে শৃঙ্খলার সঙ্গে ধীরে ধীরে দেখার জন্য আরো অনেকের সঙ্গে আমিও সাহায্য করছিলাম ! সে-সময় সেখানে দাঁড়ানো লোকজনের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা তাজউদ্দীন সাহেবের যে ছেলেটা হাইজ্যাক করে, ব্যাংক লুট করে, সে কোথায় ?' শহীদ তাজউদ্দীন আহমদের একমাত্র ছেলের জন্ম স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অথবা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই। তখন সে মাত্র ৪/৫ বছরের ছেলে। ছাদে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে আছে। আমি লোকটাকে সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, 'ঐ ছাদে একা একা দাঁড়িয়ে আছে, সেই হলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের একমাত্র ছেলে।' একইভাবে আর একটি লিফলেট ছেড়ে অপপ্রচার করা হয়েছিল পঁচাত্তরের ৫ কি ৬ নভেম্বর তারিখে স্টেডিয়ামে একটা খেলার দর্শকদের মধ্যে। সেখানে খালেদ মোশাররফ কীভাবে ভারতের কাছে বাংলাদেশ বিক্রির ষড়যন্ত্র মেতেছে তা বলা হয়েছে এবং তারই পরবর্তী ঘটনা ৭ নভেম্বর।

[সংবাদ। মুক্ত আলোচনা। ঢাকা, ১৯ কার্তিক ১৪০৫, নভেম্বর ৩, ১৯৯৮–এই লেখাটি কাজী মোহাম্মদ শীষ ওয়ালিউর রহমান রেজার কাছে শুনে টেপ করে রাখেন এবং লেখকের জবানীতে লেখেন]

নিজের চোখে দেখা বিবরণ

পঁচাত্তরে জেলখানায় চার নেতা হত্যা

বি বি বিশ্বাস

১৯৭৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর জেল গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে নতুন জেলে যেতেই প্রথম দেখা হলো জনাব তাজউদ্দীনের সঙ্গে। তিনি স্বাগত জানালেন। দেখা হলো সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শেখ আব্দুল আজিজ, কোরবান আলী, খন্দকার আসাদুজ্জামান (সচিব) এবং আরও অনেকের সঙ্গে। ১৯৭১ সালে মুজিবনগরে যাঁদের দেখেছি তাঁদের অনেককেই দেখলাম। দেখলাম কিছু অচেনা মুখ, যাদের অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা। হঠাৎ মনে হলো, তবে কি স্বাধীনতা সংগ্রাম করাটাই অপরাধ হয়ে গেল ? স্বাধীন বাংলার সৃষ্টি কি ভুলের ওপর ভিত্তি করে ? তাই বা কেমন করে হবে ? যাঁরা বর্তমানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে তাঁরা আজ কোথায় থাকতেন ?

নতুন জেলের মধ্যে যতটুকু জায়গা আছে, তার কোথাও একফোঁটা সবুজ নেই। জনাব তাজউদ্দীন তাই নিজে লেগে গেলেন একটা লন তৈরির জন্য। ডা. হায়দার আলী তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। জনাব তাজউদ্দীন ডায়াবেটিকসের রোগী। কিছু শারীরিক পরিশ্রম করা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিদিন সকালে ৩ ঘণ্টা করে তিনি মাঠ বাছাইয়ের কাজ শুরু করলেন। সমগ্র মাঠটা ভাঙা ইটের গুঁড়োয় ভর্তি। এর নিচের কিছু জায়গা কনক্রিট করা।

এগুলো তুলে না ফেললে ঘাস গজাবে না, তাই এ অভিযান। আমি যখন-তখন তাঁর কাছে গিয়ে বসতাম। ঘামে সর্বশরীর ভিজে যাচ্ছে। মাথার ওপর তীব্র রোদ। কিন্তু তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। ১৯৭১ সালে মুজিবনগরে দেখেছিলাম তাঁর এক রূপ। এখানে ১৯৭৫ সালে দেখলাম আরেক রূপ। সেখানে ছিলেন সদাব্যস্ত। এখানে অফুরন্ত অবসরের মধ্যেও কাজ খুঁজে নিয়েছেন। একটা জিনিস কিন্তু তাঁর শাশ্বত। সিদ্ধান্তের প্রতি ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠতা। একটা আবর্জনার স্তূপকে সুন্দর মাঠে পরিণত করা আপাতদৃষ্টিতে যতই দুঃসাধ্য মনে হোক না কেন, জনাব তাজউদ্দীন কাজ করেই চলেছেন।

জওহরলাল নেহরুর "ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া"য় পড়েছি এই ধরনের শখ তাঁরও ছিল। ১৯৪৫ সালে এলাহাবাদ জেলে থাকতে তিনিও এমনিভাবে ইটের টুকরো ভর্তি মাঠ পরিষ্কার করে বাগান বানিয়েছিলেন।

দুপুরের দিকে প্রায় দু'ঘণ্টা জনাব তাজউদ্দীন দাবা খেলতেন। আমাকে প্রায়ই খেলতে হতো। ডা. হায়দার আলীও খেলতেন। রাতে তাঁর কামরায় আমার যাওয়া সম্ভব ছিল না। তবে শুনেছি, তিনি জেল লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে পড়ছেন। ১নং কামরায় থাকতেন সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, শেখ আব্দুল আজিজ, কোরবান আলী, আনোয়ার জং, ছাত্রনেতা আব্দুল কুদ্দুস মাখন, দেলওয়ার হোসেন ও ডা. আসাবুল হক। এঁদের সকলেই ছিলেন এমপি। ২নং কামরায় ছিলেন সর্বজনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান, খন্দকার আসাদুজ্জামান, ডা. হায়দার আলী, মহীউদ্দীন আহমদ (মুন্সীগঞ্জ) এবং আরও কয়েকজন।

৩নং কামরায় থাকতেন সর্বজনাব মো. মনসুর আলী, আব্দুস সামাদ আজাদ, আমীর হোসেন আমু, প্রফেসর শামীম মিসির, কাজী মোজাম্মেল হক এবং শামসুজ্জোহা। এঁরাও সকলে এমপি। কিছুসংখ্যক উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাও এখানে ছিলেন। সর্বজনাব এ টি এম হোসাইন, হাজি আব্দুল জলিল, ঢাকেশ্বরী মিলের জেনারেল ম্যানেজার, বিআরটিসির চেয়ারম্যান জনাব আতিয়ার রহমান, অলিম্পিয়া টেক্সটাইলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ফরিদউদ্দিন আহমদ এবং আমি নিজেও এই কামরাতে থাকতাম।

ঢাকার প্রাক্তন সিটি এসপি জনাব মাহবুব উদ্দিন আহমদ ও সর্বজনাব সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া এবং সার্জেন্ট মুশফিকুর রহমান (দুলু) সামনের ১৫ নম্বর সেলের মধ্যে থাকতেন। ১৯৭৫ সালের ২৭ অক্টোবর ২২ বছরের কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে নিউ জেলে ফিরে এলাম। প্রথম দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখলাম জনাব তাজউদ্দীন, জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ এবং আরও অনেকেই উদগ্রীব হয়ে আছেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম অল্পের জন্য কল্লা বেঁচে গেছে। জনাব সামাদ ঠিক শুনতে পাননি। আমার হাসিখুশি ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আমি খালাস পেয়েছি তো ? আমি জানালাম, কেবল ফাঁসির নিচের সাজাটা পেয়েছি — যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। মুহূর্তে সবার মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। বস্তুত কেউ ভাবতে পারেননি যে এ মামলায় সাজা হতে পারে। আই.ও. অর্থাৎ তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জেরার মুখে পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, ২৫-২-৭২ তারিখে কোনো ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি। ১-৯-৭২ তারিখে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে এ ঘাটতি ঘটেছে ২৫-২-৭২ তারিখ হতে ১-৯-৭২

তারিখের মধ্যে। এটা দৈনিক বাংলা পত্রিকায়ও বিশদভাবে বেরিয়েছে এবং এই সময় ব্যাংকের ভল্ট ডাবল লক ছিল। এরপরও সাজা হতে পারে কেউ ভাবতেই পারেননি।

মাঝে মাঝে গুজব শোনা যেত যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে, বিশেষ করে জনাব তাজউদ্দীনকে, হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলছে। জনাব তাজউদ্দীনের কানেও সেকথা পৌঁছেছিল, তবুও তাঁকে নির্বিকার দেখা গেল। নিয়মিত শরীর চর্চা ও মাঠে প্রত্যহ তিন ঘণ্টা কাজ করেই চলেছেন। শেষ পর্যন্ত একজন জেলবাসিন্দা জনাব তাজউদ্দীনকে জানালেন যে জেলের বাইরে খুব গুজব কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে পাঠিয়েছে যে বিশিষ্ট নেতাদের জীবিত রেখে ক্যু গ্রুপের লোকেরা ভুল করেছে এবং যতশীঘ্র সম্ভব তাঁদেরকে শেষ করে দেওয়া উচিত।

পাছে যিনি এ-খবর তাঁকে দিয়েছেন তিনি চিহ্নিত হয়ে যান এজন্য বেগম তাজউদ্দীন দেখা করে যাওয়ার পরই তিনি ব্যাপারটি প্রকাশ করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে সবাই মনে করলেন বেগম তাজউদ্দীন এ-খবর দিয়ে গেছেন। এতখানি সু-বিবেচনা তাঁর ছিল। ১নং কামরার লোকদের কাছে পরে শুনেছি যে এ খবর শোনার পর তিনি কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যবহারে বা কথাবার্তায় অবশ্য আমরা তা বুঝতে পারিনি। নিয়মিত দাবা খেলা চলছিল। জোর আত্মবিশ্বাস তাঁর ছিল যে এভাবে বন্দী জীবন তাঁকে বেশিদিন কাটাতে হবে না। সব সময় আমাদেরকে অনুরূপ আশ্বাসও তিনি দিতেন।

মাঠ পরিষ্কার করার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। অজস্র ইটের টুকরা মাটির সঙ্গে মিশে ছিল। নিজ হাতে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে কাস্তে দিয়ে সেগুলো প্রায় সব পরিষ্কার করে ফেলেছেন। তিন চার বার করে এক জায়গা থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছে। এখন ঘাস লাগনোর পালা।

২ নভেম্বর বেলা ১১টার দিকে আমার জন্য অফিস কল এল। এদিন ছিল রবিবার। অফিস কলের কী কারণ থাকতে পারে চিন্তা করতে করতে পাহারাদারদের সঙ্গে জেল অফিসে ঢুকলাম, শুনলাম জেলার ডেকেছেন। জেলারের কামরায় ঢুকে দেখলাম আরও চারজন লোক সেখানে বসা। তাদের কাউকেই আমি চিনি না। আমাকে কেন ডেকেছেন জিজ্ঞাসা করায় জেলার বললেন যে, তিনি দুঃখিত আমাকে ঠিক ডাকেননি। ডেকেছেন সিভিল সার্জন মি. সাহাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপস্থিত অপরিচিত লোকদের কাছে আমার পরিচয় জানিয়ে দিলেন। ওই লোকগুলো খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসলাম।

একটু দুশ্চিন্তায় পড়লাম। যে কাগজের টুকরা পাহারাদার নিয়ে এসেছিল তাতে আমার নাম পরিষ্কারভাবে লেখা। আমাকে না ডাকলে আমার পরিচয়ই-বা ওই লোকদের কাছে দেওয়ার কী আবশ্যকতা ! ওই লোকগুলোই বা

তীক্ষ্ণভাবে আমাকে দেখল কেন। সবই আমার কাছে হেঁয়ালির মতো মনে হলো। নতুন জেলে ফিরে এসে দেখি জনাব তাজউদ্দীন বাইরে একটু ফাঁকা জায়গায় চেয়ারে বসে আছেন। খুব গরম। তদুপরি তিনি প্রায় তিন ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করেছেন বলে সম্ভবত বাইরের হাওয়ায় বিশ্রাম করছেন। জেল গেটের ঘটনার কথা বললাম। তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন. বললেন, ও কিছুই নয়।

ওই দিন রাত প্রায় ৩-৩০ মিনিটের সময় পাগলা ঘণ্টি বাজল। সঙ্গে সঙ্গে হুইসেলও বাজা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ৪-১৫ মিনিটের মধ্যেও মশাল নিয়ে কোনো লোক এল না। বাঁশি সমানে বেজেই চলল। আমরা খুব আতঙ্কিত হলাম। ঘরের সামনে দিয়ে যেসব জেল পুলিশ যাতায়াত করছিল তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিশেষ কিছু জানা গেল না। একজন জেল পুলিশ বলল সাবধানে থাকবেন। ঘণ্টি বেজেছে। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এই দিন আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়েছিলাম। ঘুম ভাঙার পরও ওষুধের ক্রিয়া ছিল। একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় দেখি ১নং কামরার সকলেই আমাদের কামরায় ঢুকছেন। কেবল নেই তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

১নং সেল থেকে সবাইকে বের হতে বলা হলে সকলে বেরিয়ে আসলেন। ছাত্রনেতা জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখনের শরীরে জ্বর ছিল। তাই তিনি গায়ে দেওয়ার জন্য একটা চাদর খুঁজছিলেন এবং সে-কারণে একটু দেরিও হচ্ছিল। কে একজন বলে উঠলেন ভিতরে কে আছে, ধরে নিয়ে আয়।

সবার অলক্ষে জনাব তাজউদ্দীন বেরিয়ে আসছিলেন। কিন্তু ৩ নম্বর কামরার সামনে থেকে তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। সম্ভবত তিনি বুঝেছিলেন যে খবর তিনি পেয়েছেন তা সত্যে পরিণত হতে যাচ্ছে। তাই একবার শেষ চেষ্টা করছিলেন। যদি ভিড়ের মধ্যে ৩নং কামরায় ঢুকে পড়া যায়। বিধি বাম। তা আর হলো না। তাঁকে ফিরে যেতে হলো সেই ১নং কামরায় যেখানে সৈয়দ নজরুল একা বসেছিলেন। ২নং কামরার একজন বললেন যে, জনাব মনসুর আলীকে নিয়ে যাওয়ার সময় সেখান থেকে জনাব কামরুজ্জামানকেও নিয়ে যাওয়া হয় ১নং কামরায়। দরজার বাইরে থেকে কে নাকি বলেছিলেন, "কামরুজ্জামান, কামরুজ্জামানকে নিয়ে এসো"।

১নং সেলে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। সকলেই দেখলাম ভয়ে কাঁপছেন। কে একজন বাইরে থেকে বললেন, "মনসুর আলী সাহেব আসুন, মনসুর আলী সাহেব।" ততক্ষণে বিছানার ওপর উঠে বসেছি। দেখি জনাব মনসুর আলী তাড়াতাড়ি একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে ফালতু মোতালিবকে বলে একটা তসবিহ হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ক্ষীণ আলোয় তাঁর চেহারা মলিনই

দেখলাম। তাঁকে দেখার ভাগ্য আর কখনও আমার হয়নি। আমি মনে করলাম হয়তো-বা রাজনৈতিক সমাধানকল্পে আলোচনা করার জন্য জনাব মনসুর আলীকে ১নং কামরায় নিয়ে গেছে। আমি আমার অভিমত ব্যক্তও করলাম। জনাব শেখ আব্দুল আজিজ রাগতভাবে বললেন যে, ঘটনা অন্যরকম। আমি চুপ করে গেলাম।

আমরা রুদ্ধশ্বাসে পরবর্তী ভবিতব্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। সমস্ত কামরা নিস্তব্ধ, নিথর। প্রত্যেকের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। জনাব মনসুর আলীকে আমাদের কামরা থেকে নিয়ে যাওয়ার পর দু'মিনিট কালও অতিক্রান্ত হয়নি, হঠাৎ সমস্ত ঘর ঝন ঝন শব্দে কেঁপে উঠল, এত কাছ থেকে আগে কখনও এমন আধুনিক সমরাস্ত্রের গুলির আওয়াজ শুনিনি। কে যেন বলে ফেলল, 'সব শেষ হয়ে গেল। সবাইকে মেরে ফেলেছে'। দিশেহারার মতো আমরা দৌড়ে উত্তর পাশের বারান্দায় চলে গেলাম। বাইরে থেকে গুলি করলে এখানে অনেকটা নিরাপদ। জনাব আজহার উদ্দীন আহমদ প্রাক্তন এমপিও এমন বেখেয়ালভাবে বিছানা ছেড়ে দৌড় দিয়েছিলেন যে, মশারিসহ তিনি দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কাঁধের মাংস খানিকটা ছিঁড়ে ফেললেন।

জনাব ফরিদউদ্দীন আহমদ খাবার রাখার জন্য কোণের দিকে যে চৌকিটা ছিল তার নিচে ঢুকে গেলেন। সামনের দিকে মুড়ির টিন ও বাক্স এমনভাবে রাখা যে, বাইরে থেকে বোঝাই যাবে না যে, এর পিছনে লোক থাকতে পারে। আমি স্রেফ মাটিতে বসে ভগবানকে ডাকা আরম্ভ করলাম। সবাই যার যার নিজস্ব সৃষ্টিকর্তাকে ডাকা শুরু করলেন। আমরা সবাই ধরে নিলাম যে, জীবন আমাদের শেষ হয়ে যাবে। এসব অস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ জনাব সাইদুর রহমান প্যাটেল বললেন যে শব্দটা স্টেনগানের এবং এক সঙ্গে অন্তত দুটো ম্যাগজিন খালি করেছে। অনেকদিন পর ওই ঘরে ঢুকে ঘরের দেয়ালের গায়ে প্রায় ৫০টা বুলেটের দাগ দেখেছি।

১নং কামরার জনাব দেলওয়ার হোসেনের কাছে শুনলাম, অনেকক্ষণ একটানা বাঁশি বাজার পর হঠাৎ ওই কামরার বারান্দার তালা খোলার শব্দ শুনে সবাই আতঙ্কিত হলেন। ২ নম্বর তালা খুলে ঘরের দরজাও খোলা হলো, সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। হঠাৎ একজন সুবেদার বলে উঠল—আপনারা সবাই বেরিয়ে যান রুম থেকে। রুমে শুধু সৈয়দ সাহেব ও তাজউদ্দীন সাহেব সামনে থাকতেন, সম্ভবত তিনি বলেছিলেন যে গুলিতে জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং জনাব কামরুজ্জামান সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। তবে জনাব তাজউদ্দীন ও জনাব মনসুর আলী বেঁচেছিলেন। গুলির আওয়াজ আমরা শুনি প্রায় ৪-২০ মিনিটের সময়। তার পরপরই ফজরের নামাজের জন্য আজান পড়ে। সেলের লোকেরা কে একজন বললেন যে তিনি শুনেছিলেন, জনাব মনসুর আলীকে যখন ১নং

কামরার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি বলেছিলেন, "আমাকে মারার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তো সেদিনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলাম" জনাব কামরুজ্জামানকে যখন কামরা থেকে বেরিয়ে আসতে বলা হয়, তখন তিনি জায়নামাজের ওপর নামাজ পড়ছিলেন। পাগলা ঘণ্টা পড়ার পর প্রায় সকলেই সে ঘরে নিজস্বভাবে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকছিলেন। ২নং কামরার কে যেন বলেছিলেন যে, গুলি হওয়ার পর দু'জনের মুখ থেকে কাতর শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। একজন "আল্লাহ আল্লাহ" বলছিলেন। আর একজন বলছিলেন কালো কালো পোশাক পরা লোকগুলো গুলি করে চলে যাওয়ার প্রায় ১৫-২০ মিনিট পর অর্থাৎ ফজরের নামাজের পর আর একদল এসে বেয়োনেট চার্জ করে সবাইকে। বেয়োনেট চার্জ করার পর অবশ্য কেউ বেঁচে ছিলেন না। অনেকদিন পর ওই ঘরের মেঝে ও দেয়ালে বেয়োনেট চার্জের অনেক দাগ দেখেছি।

৩ নভেম্বর ভোরের দিকে একজন পাহারাদার এসে সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়ে গেল চার নেতার মৃতদেহ ঘরের মধ্যে রয়েছে এবং বারান্দা দিয়ে রক্ত সামনের ড্রেনে গড়িয়ে পড়ছে। বেগম তাজউদ্দীন শনিবার দেখা করে গিয়েছিলেন। অসময়ের একটা কাঁঠালও দিয়ে গিয়েছিলেন। ডায়াবেটিক এর রোগী হওয়া সত্ত্বেও জনাব তাজউদ্দীন রবিবার সন্ধ্যার পর কাঁঠাল খেয়েছিলেন এবং কামরার সকলকে খাইয়েছিলেন। যা কিছু বাড়ি থেকে আসত তিনি সবাইকে খাইয়ে তবে নিজে খেতেন। ওই দিন রাতে তিনি বেশ কিছুক্ষণ কুরআন শরিফ পড়েছিলেন।

২নং কামরার একজনের নিকট শুনলাম জনাব কামরুজ্জামান ওই দিন মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিলেন। বেশ কয়েকবার বলেছেন তাঁকে বোধহয় হত্যা করা হবে। জনাব তাজউদ্দীনের কাছে হত্যার কথা শোনার পর তিনি ওই গুজবে সত্যই বিশ্বাস করেছিলেন। চেয়ারম্যান জিন্নত আলীর গায়ের রং ছিল মিশমিশে কালো। ওই রাতে জনাব কামরুজ্জামান পাউডার দিয়ে চেয়ারম্যানকে সাজিয়ে অনেকক্ষণ আমোদ ফূর্তি করেছিলেন। ২নং কামরার আর একজনের কাছে শুনেছিলাম, কালো পোশাক পরিহিত লোকেরা স্টেনগান প্রস্তুত করে ১নং কামরায় ঢুকলে জনাব তাজউদ্দীন বলে উঠেছিলেন, "এ কী করছেন ! এ কী করছেন !" গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনাব তাজউদ্দীন ভাবতে পারেননি ঘাতকের অস্ত্রে কারাগারে অসহায় অবস্থায় তাঁর জীবনাবসান হবে।

একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃহত্তম অবদান যাঁদের ছিল সেই চারজন নেতাকে জীবন দিতে হলো কয়েকজন অপরিণামদর্শী সুযোগসন্ধানী ঘাতকের হাতে। বাংলাদেশের কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল কেউ বুঝল না। দেশবাসীকে তিলে তিলে মর্মে মর্মে অনুভব করতে হবে এ ক্ষতি। গোটা জাতিকে এর মাসুল দিতে হবে। বাঙালিকে কাঁদতে হবে।

স্বাধীন বাংলার শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছিল মোহাম্মাদী বেগ। এ মোহাম্মদী বেগই ছোটবেলায় নবাব সিরাজুদ্দৌলার সঙ্গে একই মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়েছিল। নবাব সিরাজুদ্দৌলা মৃত্যুর আগে শুধু বলেছিলেন "মোহাম্মদী বেগ তুমি"? জুলিয়াস সিজারকে শেষ পর্যন্ত বন্ধু সহকর্মী ব্রুটাস অসি দিয়ে যখন আঘাত করেছিল তিনিও বলেছিলেন "Thou too Brutrus!" জানি না নিহত চার নেতার মধ্যে অনুরূপ কেউ কিছু বলেছিলেন কিনা তাঁদের ঘাতকদের সম্বন্ধে।

নিষ্ঠুর গুপ্তহত্যার তদন্ত একদিন নিশ্চয়ই হবে। বিচারও হয়তো-বা হবে। কিন্তু ফিরে আসবে না অমূল্য চারটি প্রাণ আর কোনোদিন। এ ক্ষতি কত বড় বাঙালি একদিন বুঝবে। এ ক্ষতি অপূরণীয়।

তারপর এল ৪ নভেম্বর—সারাক্ষণ আমাদের ঘরের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখা হলো। সমস্ত নতুন জেল নিশ্চুপ, নিথর ! শুধু মাঝে মাঝে তালা খুলে আমাদের খাবার দিয়ে যায়। ৪ তারিখ সকালের দিকে খবর পেলাম মৃতদেহগুলো একটু ধোয়া- মোছা করে বাইরের বারান্দায় রাখা হয়েছে। ঘরটা পরিষ্কার করার শব্দ পেলাম। আমাদের কামরার জানালা দিয়ে ১নং কামরার সামনে রক্তমাখা কাপড়-চোপড়ও দেখা গেল। শুনলাম এডিসি এবং এসপি এসে দেখে গেছেন, ঘরের ও মৃতদেহগুলোর ফটোও নিয়েছেন। ময়না তদন্ত হয়ে গেল। ৪ তারিখ সন্ধ্যার দিকে বরফ ভাঙার আওয়াজ এবং বাক্স তৈরির শব্দ পেলাম। বাকি থাকল শুধু কবর দেওয়া।

জেল কর্তৃপক্ষকে আবেদন জানালাম, মৃতদেহগুলো দেখার এবং শ্রদ্ধা জানানোর অনুমতি চেয়ে। একবার মনে হলো, হয়তো-বা অনুমতি পাওয়া যাবে। কিন্তু হলো না। রাত ১১টার দিকে মৃতদেহগুলো বাক্সবন্দি করে জেলগেটের দিকে নিয়ে গেল। মুজিবনগরে এক সঙ্গে কাজ করেছি দীর্ঘ নয় মাস। জেলখানায়ও অনেকদিন একসঙ্গে ছিলাম। সুখ-দুঃখ সমানভাবে ভোগ করেছি। সকলে যেন এক পরিবারভুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। একের দুঃখে অন্যজন শুনিয়েছেন সান্ত্বনাবাণী। মাত্র বিশ হাত দূরে থাকা সত্ত্বেও আজ শোনাতে পারলাম না বিদায়ের বাণী, জানাতে পারলাম না শ্রদ্ধার্ঘ্য। এ যে কত বড় মর্মান্তিক, ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। প্রাণ স্পন্দন যেন থেমে গেছে আমাদের। গুমরে ফিরছে বোবা কান্না।

প্রবাসী : নিউইয়র্ক
১১ নভেম্বর ১৯৯৪

আব্বুর হৃদয় বিদারক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মামাতো বোন ইয়াসমিন ও নাসরিনকে লেখা চিঠি। ৯.১১.১৯৭৫

বাংলাদেশের রাজনৈতিক গবেষণা পরিষদ
COUNCIL FOR POLITICAL RESEARCH, BANGLADESH

Founder : M. A. BARI
Advocate,
Bangladesh Supreme Court,
Dhaka

71, Central Road,
Dhanmondi, Dhaka,
Phone : 50 39 86

Date.........................

বর্তমান সরকারের বহুল প্রচারের প্রেক্ষিতে আমার ধারণা যে, দেশের প্রশাসনিক পরিমন্ডলে নিরপেক্ষতা বিরাজ করছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই উল্লেখিত হত্যাকান্ড গুলোর তদন্ত পূর্বক দন্ডবিধির সঠিক ধারামতে প্রকৃত হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আদালতে সোপর্দ করায় বর্তমান সরকারের তরফ থেকে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবেনা বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাছাড়া, আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়ে-ছেন জাতির জনক ও প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, একজন মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি, দুইজন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, দুই জন মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসারগণ। যাঁহারা জাতির হাজার বছরের সুপ্ত ও রক্ত-ক্ষয়ী সংগ্রামকে বাস্তবে রূপ দিতে জীবন উৎসর্গ করেছেন সুদক্ষ নেতৃবৃন্দ। দুর্ভাগ্যের হলেও অতীব সত্য যে, সেই যুদ্ধের দেশ সোনার বাংলা তাঁদের স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। মূল্য-বোধের চরম অবঃপতনে সুশিক্ষিত বিশ্ব বিবেক - নিদারুণ ভাবে লজ্জিত মানবিক সভ্যতা। নৈতিক মূল্য-অবক্ষয়ের এই তীব্র অবস্থা আমাদের সকলকেই কম বেশী পীড়া দেয়। উল্লেখিত নজীর বিহীন হত্যাকান্ডের যথোপযুক্ত বিচার না হলেও অন্ততঃ বিলম্ব বিচারের ন্যূনতম সূচনা দিয়েই বর্তমান সরকার নিরপেক্ষতার স্বচ্ছ দৃষ্টান্ত স্থাপন ও অন্যদিকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা আইনের শাসন কায়েমের অনন্য নজীর সৃষ্টি করতে পারেন। নতুবা অনাগত ভবিষ্যতে ইতিহাসের কঠোর বিচারে সকলকেই হাজির হতে হবে বিচারের কাঠ গড়ায়। সেদিন প্রকৃতই বিচার হবে উল্লেখিত হত্যাকান্ডের নায়কদের এবং বিচার হবে আমাদের যারা, নিশ্চুপ ভাবে প্রত্যক্ষ করে চলেছি সর্বকালের হৃদয় বিদারক ঘটনাবলী। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় সহায়তাদানে পরম করুনাময় আল্লাহ পাক আপনাকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় সেই ক্ষমতা বলে আপনি উপরিউল্লেখিত একাধিক নিষ্ঠুর হত্যা সম্পর্কিত মামলা গুলোর প্রয়োজনীয় আইনগত

পর পাতায় ...৩/

বাংলাদেশের রাজনৈতিক গবেষণা পরিষদ
COUNCIL FOR POLITICAL RESEARCH, BANGLADESH

সভাপতি : M. A. BARI
Advocate.
Bangladesh Supreme Court.
Dhaka

71, Central Road,
Dhanmondi, Dhaka
Phone : 50 39 85

Date.........................

ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করবেন। ন্যায়পরায়ণ এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপের জন্য ন্যায় বিচার প্রার্থী সকল মহলের জনগণই আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকবে। পত্রের প্রত্যাশায়"।

এজাহার দাখিলের পর আপনি তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট থানা সমূহে নির্দেশ প্রদান করেছেন কিনা জানি না - তবে আমাকে কোন উত্তর দেন নি। এই নীরবতা থেকে আমি অনুমান করতে পারি যে, এই বিষয়টি আপনাকে বিব্রত করছে। সম্ভবতঃ যে কারণে আপনি নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারেন তা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। প্রথমতঃ সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা যা ১৯৭৫ সালে ২৬ শে সেপ্টেম্বরে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়। দ্বিতীয়তঃ জেল হত্যার অব্যবহিত পরেই বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য গঠিত কমিটির নিষ্ক্রিয়তার প্রতিফলন। জেল হত্যার বিচার প্রার্থী জনগণ এই দুটি বিষয়ের প্রেক্ষাপট ভিন্ন ভাবে বিবেচনা করেন। একটু তলিয়ে দেখলেই অনুমান করতে অসুবিধা হবে না যে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডকে ১৯৭৫ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বরে সৃষ্ট পঞ্চম সংশোধনীর ছত্রছায়ায় আশ্রয় করলেও চার নেতার জেল হত্যাকে এই সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। নজীর বিহীন নিধন ঘটনার পর পরই প্রেসিডেন্সিয়াল নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণবশে সেই কমিটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কোন বিজ্ঞপ্তির দ্বারাই এই তদন্তের পরিসমাপ্তি হয় নি বিধায় চার নেতার জেল হত্যার তদন্ত থেকে বাংলাদেশ দন্ড বিধির যথাযথ ধারা মোতাবেক দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে সময় কোন যুক্তি সঙ্গত উপাদান নয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ৪ জন সহকর্মীর হত্যা তদন্তে আন্তর্জাতিক জুরি

পর পাতায় ...৪/

বাংলাদেশের রাজনৈতিক গবেষণা পরিষদ
COUNCIL FOR POLITICAL RESEARCH, BANGLADESH

Head : M. A. BARI
Advocate,
Bangladesh Supreme Court,
Dhaka.

71, Central Road,
Dhanmondi, Dhaka.
Phone : 50 39 86

Date........................

কমিটি গঠিত হয়েছিলো। কিন্তু জিয়া সরকার সেই তিন কমিটিকে বাংলাদেশে আগমনের ভিসা প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। বিস্ময়ের বিষয় পরিহাস যে, রাষ্ট্রপতি জিয়া ও অনুরূপ করুণ পরিণতির শিকারে পরিণত হন এবং তার হত্যা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিটিও পরে মধ্যে অনুরূপ হস্তক্ষেপে স্থগিত হয়ে পড়ে। বিদেশবাসী ব্যক্তিদের ধারণা, দায়বদ্ধতাও সরকারের সাক্ষাৎ দুষমনেরা সক্রিয় রয়েছে অথবা জেল হত্যাকারীদের স্বার্থে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে অবক্ষয়ের গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের আইনের শাসন ও সামাজিক ন্যায় বিচার। অথচ, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই আবেদন করা হয় নি। দেশে স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি সুনিশ্চিত করুন এবং রাজনৈতিক কারণে অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত পূর্বক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দাবী বাংলাদেশ রাজনৈতিক গবেষণা পরিষদের একাডেমিক কার্যক্রমের অংশ বিশেষ।

বিষয়টি এই আবেদনের পরিধি শুধু বঙ্গবন্ধু ও ৪ (চার) জাতীয় নেতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে যে, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন তাঁদের হত্যার সঠিক কারণও আইনানুগ বিচারের ফলাফল অবগত হওয়া দরকার। স্বাধীনতার পর থেকেই নিহত হয়েছেন অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা, সামরিক অফিসার ও জোয়ান এবং অগণিত রাজনৈতিক প্রাণবন্ত কর্মী। এই অস্থিরতার কারণ নির্ণয়ে প্রয়োজন বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক তদন্ত। নিরপেক্ষ তদন্ত শুধু দোষী ব্যক্তির শাস্তির ব্যবস্থা নয়ই অনুমোদন করবে না; পাশাপাশি অপরাধ প্রবণতার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সূত্র গুলো চিহ্নিত করে। যে, কোন অপরাধ দমনে বিশেষ করে মানুষ হত্যার মত জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর শাসন সকল শান্তি কামী মানুষের প্রত্যাশা। এই আইনের শাসনে যিনিই বাধা দেন অপরাধ প্রবণতার প্রেতাত্মা তাকেই সর্বাগ্রে নির্বাক তবে গ্রাস করে। এ প্রবাদের পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক গবেষণা পরিষদ
COUNCIL FOR POLITICAL RESEARCH, BANGLADESH

Convenor : M. A. BARI
Advocate,
Bangladesh Supreme Court
Dhaka.

71, Central Road,
Dhanmondi, Dhaka.
Phone : 50 35 86

Ref :..................   Date.............................

(৫ নং পাতা)

নিকট অতীতের ইতিহাসই তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। আশা করি আপনি এই বক্তব্যের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত. এবং জেল হত্যা তদন্ত শুরু করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সৃষ্টিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত। আমার প্রার্থনা, আপনি এই ক্ষমতার সৎ ব্যবহার করিবেন। আপনার সহানুভূতার জন্য চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

শ্রদ্ধান্তে

(এম, এ, বারী)
আহবায়ক

বাংলাদেশের রাজনৈতিক গবেষণা পরিষদের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এম.এ বারী জেল হত্যার তদন্ত দাবি করে তৎকালীন আই.জি পুলিশের কাছে যে চিঠি লেখেন তার কপি।

মহামান্য,
রাষ্ট্রপতি সমীপেষু,
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
রাষ্ট্রপতি সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ- ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাজউদ্দিন আহাম্মেদ সহ ৪ জন জাতীয় নেতার নৃশংস হত্যার তদন্ত দাবী।

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

বিনীত নিবেদন এই যে, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের স্থপতির ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ প্রথম উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অর্থমন্ত্রী মনসুর আলী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান নিরাপত্তা আইনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। শুনা যায় তৎকালীন স্বঘোষিত সরকার প্রধান এর নির্দেশেই কতিপয় সশস্ত্র ব্যক্তি কারা দপ্তরের ডি, আই, জি, কে প্রহার ও সকল নিয়ম কানুন ভংগ করতঃ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বে-আইনী ভাবে প্রবেশ পূর্বক উল্লেখিত নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে। বুলেট ও বেয়নেটের উপর্যুপরি আঘাতে অপর তিনজন নেতা সংগে সংগে শাহাদত বরণ করলেও বিশেষ সূত্রে জানা যায় বিপ্লবী নেতা তাজউদ্দিন আহমেদ নৃশংস ঘটনার পর বেশ কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় কারা কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। নতুবা শুধুমাত্র রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ করতে পারলেই তাজউদ্দিন আহমেদের মূল্যবান জীবন রক্ষা করা সম্ভব হত। ঘটনার অব্যবহিত পরেই তিনজন বিচারপতির সমন্বয়ে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেই কমিটির কার্যক্রম পথিমধ্যে স্থবির হয়ে যায়। এই হৃদয় বিদারক হত্যাযজ্ঞের পর দেশে অনেকদিন স্বাভাবিক অবস্থা অনুপস্থিত ছিল। আইনের শাসন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি সন্মান প্রদর্শন এর সুযোগ উন্মুক্ত হবার পরই বাংলাদেশের রাজনৈতিক গবেষণা পরিষদ নামে একটি সংস্থা এই হত্যাযজ্ঞের তদন্ত শুরু করতে বাংলাদেশের পুলিশ প্রধানকে অনুরোধ করে। প্রমান স্বরূপ উক্ত আবেদনের কপি দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করা হল।

মহাত্মন,

আমাদের বিশ্বাস এই সরকার নিরপেক্ষ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রত্যয়ী। সরকারের সম্যক দৃষ্টি ভংগির কারণেই আশা করব আপনি সরকার ও রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে উদারচিত্তে এই নজির বিহীন হত্যা তদন্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতঃ একদিকে বাংলাদেশের অন্যতম স্থপতিদের প্রতি সন্মান প্রদর্শন ও তাঁদের হত্যাকান্ডে জড়িত ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধীদের শাস্তি বিধানে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহন করবেন। আপনার-

(পরের পাতায়-----২)

মহানুভবতার জন্য শান্তিকামী জনগণ চিরদিন দোয়া করবে। ইতি-

বিনীত -

১।

২।

৩।

৪।

জেল হত্যার বিচার দাবি করে রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের কাছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক গবেষণা পরিষদের পক্ষ হতে অ্যাডভোকেট এম.এ বারীর লেখা চিঠির ড্রাফট।

জেল হত্যার বিচার দাবি করে তাজউদ্দীন আহমদের জন্মস্থান দরদরিয়া গ্রামসহ গাজীপুর এলাকাবাসীদের স্বাক্ষর। লেখক ১৯৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে গিয়ে এই স্বাক্ষরগুলো সংগ্রহ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক গবেষণা পরিষদকে দেন। কিন্তু তদন্তের দাবি করে সরকারের কাছে পাঠানো কোনো চিঠিরই জবাব আসেনা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

জেলহত্যা দিবস

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দীন আহমেদ

এম মনসুর আলী

এ এইচ এম কামরুজ্জামান

আগামী ৪ঠা নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্নিয়ার উদ্যোগে এক আলোচনা ও শোক সভা। সভায় স্বাধীনতার সপক্ষের সকল বাংলাদেশী ভাই-বোনদের আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

প্রধান অতিথি :

মরহুম তাজউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ কন্যা

শারমিন আহমদ রিপি

স্থান : Shato Recreation Ctr, 3191 W. 4th St, LA, CA 90020

সময় : সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত

বিশেষ অতিথি : ড. ওয়ালী মণ্ডল, মুস্তাইন দারা বিল্লাহ, সর্দার চান শরিফ, হাবিব আহমেদ টিয়া। সোহেল রহমান বাদল, সভাপতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

মেজবাহ খান ফারুক
সেক্রেটারি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

২০০৬ সালে জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্নিয়ার আমন্ত্রণ

From : Toha Abul
Sent : Monday, November 6, 2006 11:10 pm
Subject : Speech in Jail Hothya Dibosh
Dear Reepi,
Thank you for coming to LA and find some valuable time to share with us even with your busy schedule. I was very delighted to attend that meeting and specially hearing from you. It's a rare experience in my life to hear your speech and I'm sure will stay for a long time in my memory. Your speech was well organized, informative and I have learned many untold stories. During your speech I felt your pain. It's an awesome moment when you shared your pain with us. You've carried this pain for the last 31 years. How did you contain this pain? I think that in my situation I would not survive that long. You are living with a tragedy. Your family tragedy has transfomed into strength for you. I believe in your 4 Ts (Truth, Tragedy,Time and Transformation) which you mentioned in your speech. This concept is new to me and I can completely agree on this. You lectured like a Professor. I don't know your profession. Our country needs your leadership—our old politicians can't give much to us. To bring youth and young generation and to know the history of Bangladesh, your vision and philosophy should be followed.

I pray for you and your family's happiness, peace and prosperity.

Your well wisher
Abul Kashem Toha
California

Dear Abul Kashem Toha,

Thanks for your thoughtful response. I feel truly humbled as well as inspired by your comments.

It has been equally a rewarding experience in meeting forward thinking people like you. You have asked me as to how I have endured this tragedy. I feel that it's through my faith in God that I was able to cope. According to the configuration of quantum physics, time and space are comparative. In comparision with eternity our earthly life is momentary. In this transitory existence we are bound by certain laws which determine our place in the timeless zone. My father was a person who was able to rise above the mundane and embrace the higher principles of life, i.e. compassion and justice. He led an exemplary life and left for us his unfinished dream of a society free of coersion and exploitation. Whatever role we may play or whatever pursuit we may choose must then be entwined with service for humanity. It's the only way to transform tragedy into hopes and dreams.

With best regards,

Sharmin Ahmad

জেল হত্যা দিবসে আমন্ত্রিত অতিথি ক্যালিফোর্নিয়াবাসী আবুল কাশেম তোহার চিঠি ও লেখকের উত্তর।

বাংলা রিপোর্টার
মন্ট্রিয়লে 'নিঃসঙ্গ সারথি' প্রদর্শন হচ্ছে

মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারই সফলভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এই আদর্শবান ক্ষণজন্মা পুরুষ, দূরদর্শী রাজনীতিক, অমীয় মেধা-সম্পন্ন অর্থনীতিবিদ তাজউদ্দীন আহমদ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হন '৭৫-এর নভেম্বরে। রাতের অন্ধকারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় নেতা ও সহমুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী এবং এইচ কামরুজ্জামানসহ তাজউদ্দীন আহমদকে নির্মমভাবে হত্যা করে আততায়ীরা। সেই মহান পুরুষ তাজউদ্দীনের জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে সৃজনশীল পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল নির্মাণ করেছেন একটি প্রামাণ্যচিত্র নিঃসঙ্গ সারথি। ছবিটি প্রদর্শিত হবে এবারের জেল হত্যা দিবসে।

স্থান : গ্রিক চার্চ অডিটোরিয়াম, ৭৭৭ সেন্ট ব্লক, পার্ক এক্স, মন্ট্রিয়াল।

সময় : ৩ নভেম্বর, বিকাল ৪টা।

আয়োজনে : আকলিমা সরকার ও তাজুল মোহাম্মদ (মন্ট্রিয়ল); মিজান রহমান (অটোয়া)।

উপস্থাপনায় : হাসান মাহমুদ (টরন্টো)

অংশগ্রহণে : শারমিন আহমদ (ওয়াশিংটন); ড. ওয়াইজ উদ্দিন আহমদ (মন্ট্রিয়ল); ড. এ কে মোমেন (বস্টন) ; ড. নুরন্নবী (নিউইয়র্ক); লুৎফর রহমান রিটন (অটোয়া); সেলিম সামাদ (টরন্টো); রোকেয়া হায়দার (ভোয়া, ওয়াশিংটন)

বিশেষ আলোচ্য বিষয় : 'তাজউদ্দীন আহমদ ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' এবং 'তাজউদ্দীন আহমদ ইন্সটিটিউট অব ফ্রিডম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি'- এর পরিকল্পনা।